শুকতারা

৫৩

নবম সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৪০৭
১০.০০

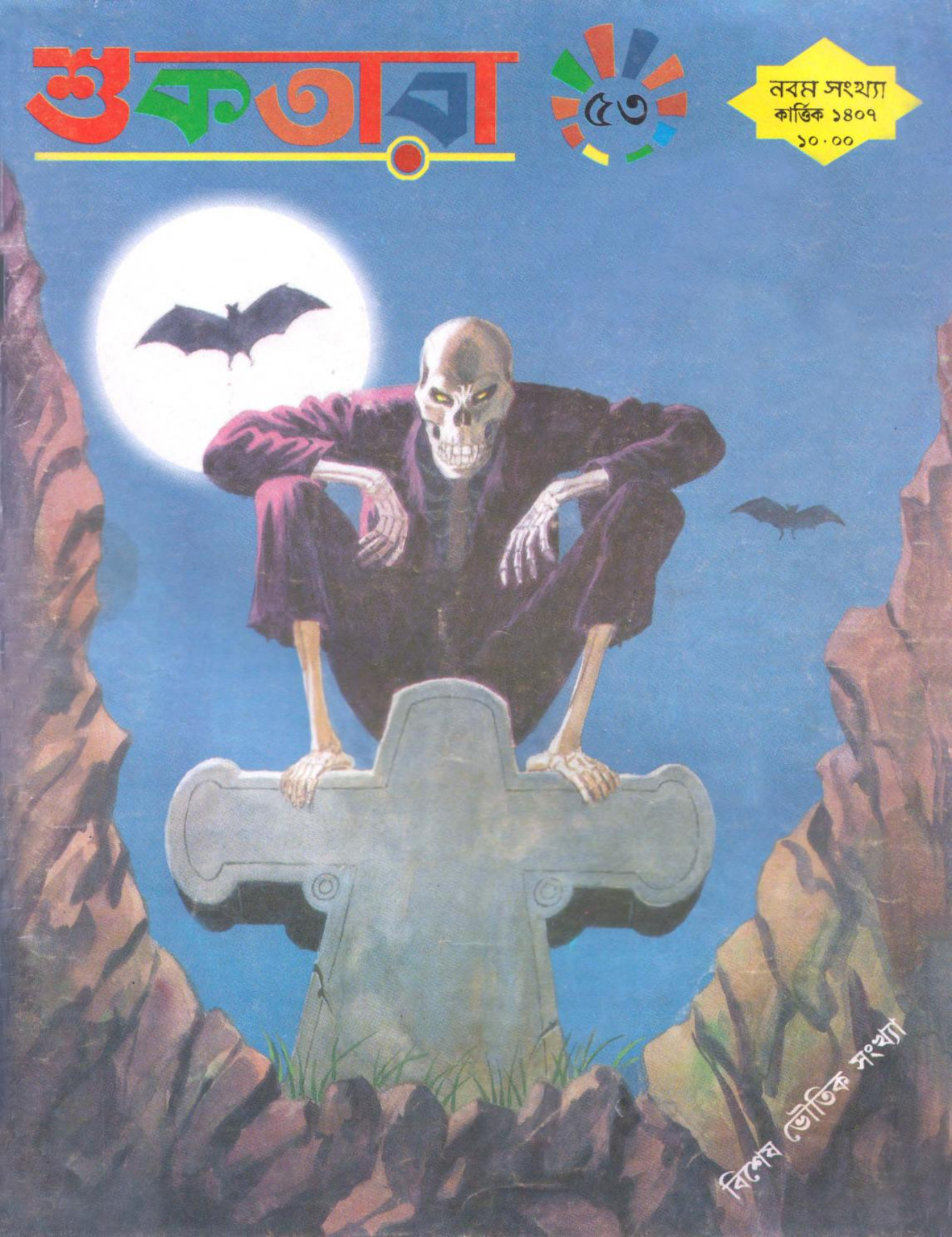

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

ভারতবর্ষে সবাধিক বিক্রীত কমিকস
ডায়মণ্ড কমিকস

অক্টোবরে পড়ুন

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব -এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫-টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম এবং ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী! ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি **'ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব'**-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি. পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : ____________

ঠিকানা : ____________

পোস্ট : ____________ জেলা : ____________

পিন কোড : ____________

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : ____________

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

ঐই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. A-11, সেক্টর-58 নয়ডা-201301 (উ. প্র.)

বাঁটুল দি গ্রেট

দৌড় ঝাঁপে কৃতিত্বের জন্যে তোমাদের দুজনকে স্বর্ণপদক দেওয়া হলো।

অনুষ্ঠান শেষে-
বিকেল হয়ে আসছে। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই মাঠটা আমাদের পেরোতে হবে।
কেন গো, বাঁটুলদা, কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি?
কি ব্যাপার বলো তো?

সন্ধ্যের পর এখানে নাকি ব্রহ্মদৈত্যের কাছারি বসে। তখন যারা এখান দিয়ে যায় তাদের ঘাড় মটকায়!
ওরে বাবা! তাহলে কি হবে, বাঁটুলদা!

ঐ যে দূরে গাছ ওখানেই নাকি কাছারি বসে। তাতোরা যা হাঁটছিস তাতে পার হওয়ার আগেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।
আর জোরে হাঁটতে পারছি না, বাঁটুলদা!

আমাদের কাঁছারি বসার টাইমে তো উঁয়ে কেউ এঁখান দিয়ে যাঁয় না, দেঁখ্‌ছো এঁতো সাঁহস কাঁদের!
শেষ পর্যন্ত এদের খপ্পরে পড়তেই হলো।
মানুষটাকে খুব চেনা চেনা লাগছে রে, শামদো!

এঁবারে চিঁনেছি রেঁ, শাঁমদো! এঁ অঁতি সাঁংঘাতিক মাঁনুষ! এঁই আঁমাকে বেঁহ্মদত্যি বাঁনিয়েছে। ওঁর মুঁণ্ডুটা চঁটকে মাঁঠেতেই পুঁতে ফাঁল্!

পুঁতে ফেঁলার আঁগে ওঁদের স্বর্ণপদক দুঁটো খুঁলে নিঁই। ভূঁত হঁয়েও সোঁনার লোঁভটা ছাঁড়তে পাঁরিনি।
ওদিকে হাত বাড়ালে আমিই লোভটা ছাড়িয়ে দেবো!

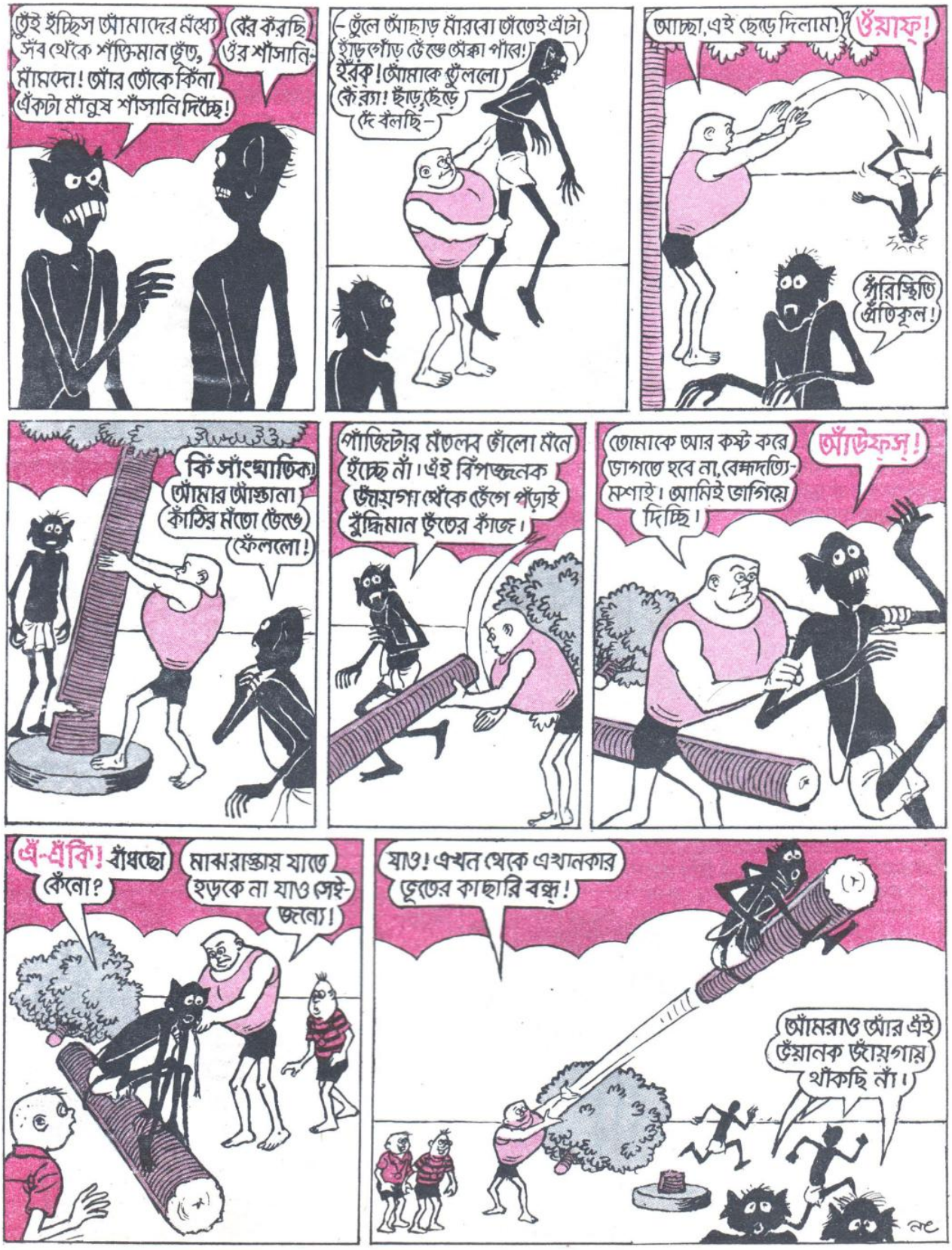

তুই হচ্ছিস আমাদের মধ্যে সব থেকে শক্তিমান ভূত, মামদো! আর তোকে কিনা একটা মানুষ শাসানি দিচ্ছে!
বের করছি ওর শাসানি-
-তুলে আছাড় মারবো তাতেই এটা হাড়গোড় ভেঙে অক্কা পাবে!
ইরক্! আমাকে তুললো কেরা! ছাড়, ছেড়ে দে বলছি-
আচ্ছা, এই ছেড়ে দিলাম!
ওঁয়াফ্!
পরিস্থিতি প্রতিকূল!
কি সাংঘাতিক! আমার আস্তানা কাঠির মতো ভেঙে ফেললো!
পাজিটার মতলব ভালো মনে হচ্ছে না। এই বিপজ্জনক জায়গা থেকে ভেগে পড়াই বুদ্ধিমান ভূতের কাজ।
তোমাকে আর কষ্ট করে ভাগতে হবে না, ব্রহ্মদত্যি-মশাই। আমিই ভাগিয়ে দিচ্ছি।
অ্যাউফস্!
এ-একি! বাঁধছো কেনো?
মাঝরাস্তায় যাতে হড়কে না যাও সেই-জন্যে!
যাও! এখন থেকে এখানকার ভূতের কাছারি বন্ধ!
আমরাও আর এই ভয়ানক জায়গায় থাকছি না।

শুকতারা

সূচীপত্র

কার্ত্তিক ১৪০৭
অক্টোবর ২০০০

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88).

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে ঃ বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ২৬০ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA - By Air Mail Rs. 645.00.
R.N.I. Registration No. 2621/57

মূল্য ঃ দশ টাকা

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

তোমরা কেউ কি সত্যি ভূত দেখেছো? শপথ করে কেউ কি তা বলতে পারো? পারো বা নাই পারো ভূতেদের নিয়ে কৌতূহলের তো শেষ নেই তোমাদের। তাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে লেখা-লেখিরও অন্ত নেই। পৃথিবীর সব দেশে সব ভাষাতেই ভূতেদের আলাদা স্থান। ভূতেরাও নানা রকম। গেছো ভূত, মামদো ভূত, স্কন্ধকাটা—আরো কতো কি! সেই সব বিচিত্র ভূত নিয়ে এবারের সংখ্যা ঃ

৬ [redacted]

সশরীরে অশরীরী
—উজ্জ্বল মল্লিক

রাতের সোলাঙ
—অনিল বিশ্বাস ৫৪

নীলপুরের মিলুমামা
—মনোতোষ মিশ্র ২৩

ঋণ পরিশোধ
—জগন্নাথ চক্রবর্তী ১২

সেই অদ্ভুত বাড়িটা
—চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ ১৭
ভূতের বাপের ছেরাদ্দ
—সুবোধ তালুকদার ৬৬
ভুতুর ইচ্ছে
—কল্যাণী চক্রবর্তী ৬৮
আঁধার রাতের বন্ধু
—সোমনাথ নন্দী ৭২
অনধিকার প্রবেশ
—পার্থসারথি চন্দ্র ৩৮
শেষ দেখা—সুব্রত দাস ৭০

৩৪

স্বাগত ২০০০

ফিরে দেখা
—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
হাজার বছর ঃ এই মাস
—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২

৫৮

যেসব কথা তোমরা কাউকে বলতে পারো না অথচ উত্তর খুঁজে বেড়াও, তোমাদের সেই সব সমস্যার সমাধান পাবে শুকতারার পাতায়। তোমাদের চিঠির উত্তর দিচ্ছেন জগদিন্দ্র মণ্ডল—**মনের জানলা-য়**।

২৮

তোমাদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা তুলে ধরার জন্যে ক্লাশের সবাই মিলে কলম ধরো। তোমাদের পাতার নতুন সংযোজনে তোমাদেরই বক্তব্য তুলে ধরার নিজস্ব বিভাগ—**আমরা বলছি।**

২২

সেরা চিঠি লিখলেই পুরস্কার। ভাবনা-চিন্তা করে চিঠি লেখো চিঠিপত্রের পাতায় আর চটপট জিতে নাও ১০০ টাকা পুরস্কার।

৪৯

পুরস্কৃত গল্প

শরণাগত (প্রথম)
—শিবানী নন্দী
আলোর ঠিকানা (দ্বিতীয়)
—সোনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০

৩৭

নাটক

নাট্যে কথামৃত
—জ্যোতিভূষণ চাকী

ফিচার

বিজ্ঞানের খবর
—সন্দীপ সেন ১৬
কেরিয়ার গাইড
—ডি. এ. চন্দ্রণ ৫২
সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি ২৯
বিচিত্র খবর
—বরুণ মজুমদার ২১, ৬৪
জানা-অজানা
—মহসীন মল্লিক ৫৩

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শা. প্রি. ব. ৪১
ওলিম্পিকে মেয়ে
—সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৪৫
উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৭
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৪৮

কবিতা ও ছড়া

আজগুবি অল্প ভূতেদের গল্প
—ধ্রুব স্বর্ণকার ৫
ভূত ব্যবসা লাটে
—অরুণ ঘোষাল ৬৫
খোকা বলে—সুবীর গুপ্ত ৬৫
গেছো ভূত
—অশোক লাখদার ৬৫
সেই মাছটা—কেয়া মিত্র ৬৫

বিভাগীয় লেখা

দাদুমণির চিঠি ২৫
তোমাদের পাতা ২৬
মজার পাতা ৬২

১

ছবিতে গল্প

বাঁটুল দি গ্রেট
—নারায়ণ দেবনাথ
হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ৩০
ব্ল্যাক ক্যাট ৬০
কার্টুন—সুফি ১৫

প্রচ্ছদ—নারায়ণ দেবনাথ

ঘোষণা

শচীন্দ্রলাল সেন
স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫১
জানো কী! ৫৯

৫৩ বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● কার্ত্তিক ১৪০৭ ● অক্টোবর ২০০০

আজগুবি অল্প ভূতেদের গল্প

ধ্রুব স্বর্ণকার

ঘুটঘুটে রাত্তিরে বড়ো বাঁশতলাতে
ডাক ছাড়ে কে বা কারে খনখনে গলাতে
পাশ দিয়ে গেলে কেউ ধরে খুব চটপট
মাটিতে আছড়ে মারে ঘাড় ভাঙে মটমট।

নাকী সুরে গান গায় রোজই রাত দুপুরে
ঝুপ-ঝাপ ধুপ-ধাপ ঝাঁপ দেয় পুকুরে
চকচক খুন চোষে দাঁত করে কড়মড়
ভয় পেয়ে ছোটে কারা ওই শুনি ধড়মড়।

চুপ করো যতসব আজগুবি গল্পে,
ভয় কি খাওয়াতে পারো আমাদের অল্পে ?
বোকা যারা ভীতু যারা তাদেরই এ শোনাবে,
ভূত প্রেত দত্যির সংখ্যাটা গোনাবে।

ছবিঃ সুফি

সশরীরে অশরীরী

উজ্জ্বল মল্লিক

উনিশশো সত্তর সালের কথা। কলকাতা তখন নকশাল আন্দোলনের দাপটে অস্থির। মফস্বলের অবস্থাও একই রকম। এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় নিশ্চিন্তে যেতে পারে না। সবাই সবাইকে ভাবে পুলিশের চর। তখন যত্রতত্র রাতের বেলা রেড করে পুলিশ তুলে নিয়ে যেত কৈশোরের শেষ প্রান্তে আসা ছেলে-গুলিকে। আমরা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগের ছাত্র ছিলাম। নকশাল আন্দোলনের ঢেউ সর্বপ্রথম এসে এই কলেজেই আছড়ে পড়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করা বহু ছাত্রও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আশেপাশের পাড়ার বেশ কিছু নকশাল নামধারী ছেলে। আমরা যারা একটু ভীতু প্রকৃতির ছিলাম, তারা কিন্তু এরই মধ্যে ঠিক গা বাঁচিয়ে চলতাম। আমরা ওদের সমর্থন করি বা না করি নকশালরা জানত আমরা ওদেরই সমর্থক।

পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর কলেজের লাইব্রেরিতে একদিন কি একটা কারণে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছিল। ব্যস অমনি কলেজ বন্ধ হয়ে গেল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কলেজের ভেতরেই বসল পুলিশ পিকেট দীর্ঘদিন ধরে। এদের বলা হতো সি. আর. পি । বেশ কয়েকদিন ছুটি কাটাতে কাটাতে হাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। এদিকে কলেজ বন্ধ থাকায় পড়াশোনাও হচ্ছে না ঠিকমতো। এরই মধ্যে আমরা চার বন্ধু ঠিক করলাম কয়েকদিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও একটা ঘুরে আসব। টিউশনি করতাম সকলেই। তখনকার দিনে অভিভাবকদের কাছে ঘুরতে যাব বলে টাকা চাওয়ার প্রশ্নই উঠত না। এর ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হতো। প্রত্যেকেরই দু'তিনশো টাকা জমে ছিল। হিসেব করে দেখা গেল চারজনে মিলে মোট হাজার খানেক টাকা ব্যয় করতে পারা যাবে। বন্ধুদের নামগুলো বলে দিই। আমি আর ধীরাজ থাকতাম একই পাড়ায়। অর্থাৎ মধ্য কলকাতায়। পলাশ থাকত শ্যামবাজারে। আর দীপেন থাকত তখনকার কলকাতার সবচেয়ে খারাপ জায়গা বেলেঘাটায়। সেখানে রোজই কোনও না কোনও সময় বোমাবাজি গুলিগোলা চলতই।

যাই হোক, কোথায় বেড়াতে যাব সেই নিয়ে আমরা পড়লাম মহা সমস্যায়। খুব বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। কারণ, তাহলে বাড়িতে রাজী হবে না। হোটেলে থাকা চলবে না। অনেক খরচ। তাহলে ? যদি কোনও আত্মীয়ের বাড়ি বাইরে কোথাও থাকে তাহলে সেটাই একমাত্র ভরসা। এই আলোচনাই হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। হঠাৎ পলাশ বলল, আমার মামার বাড়ি যাবি ?

আমরা বললাম, কোথায় ?

নবদ্বীপে।

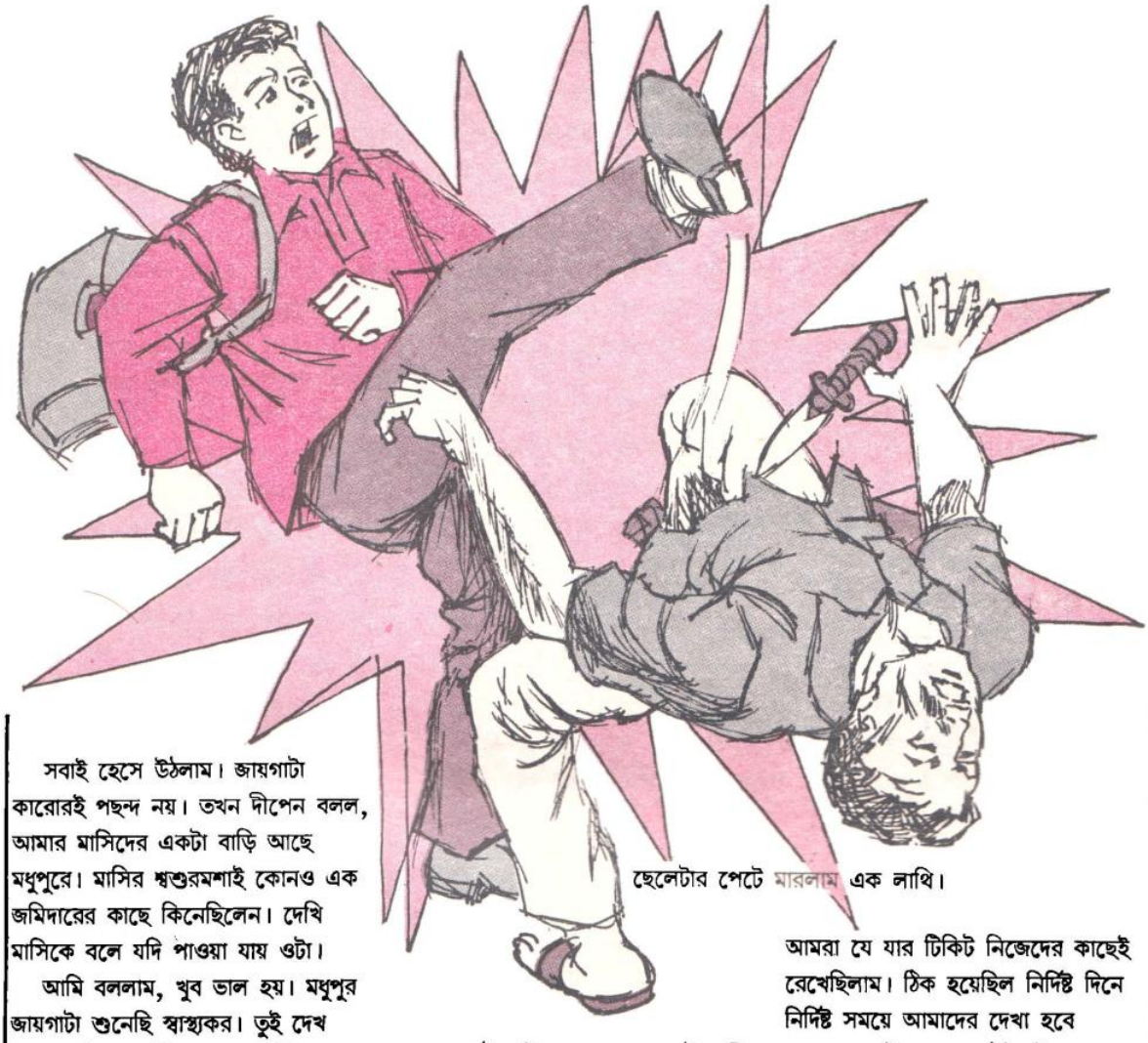

ছেলেটার পেটে মারলাম এক লাথি।

সবাই হেসে উঠলাম। জায়গাটা কারোরই পছন্দ নয়। তখন দীপেন বলল, আমার মাসিদের একটা বাড়ি আছে মধুপুরে। মাসির শ্বশুরমশাই কোনও এক জমিদারের কাছে কিনেছিলেন। দেখি মাসিকে বলে যদি পাওয়া যায় ওটা।

আমি বললাম, খুব ভাল হয়। মধুপুর জায়গাটা শুনেছি স্বাস্থ্যকর। তুই দেখ তোর মাসিকে রাজী করাতে পারিস কিনা?

কলেজ বন্ধ থাকলেও আমরা কিন্তু ঠিক নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতাম। কয়েকদিন পর দীপেন এসে বলে গেল, মাসিকে ম্যানেজ করে ফেলেছি। ঘরের চাবিও দিয়ে দিয়েছে আমাকে। সঙ্গে একটা চিঠি লিখে দিয়েছে মালীকে। ওখানে গিয়ে মালীকে দেখাতে হবে।

পরদিন সবাই মিলিত হলাম কলেজ স্কোয়ারে। ওটাই ছিল আমাদের মিটিং-এর জায়গা। ঠিক হলো সামনের রবিবার আমরা রওনা হব। এখন যেটার নাম পূর্বা এক্সপ্রেস তখন ওটার নাম ছিল ডিলাক্স। সকাল নটা নাগাদ ছাড়ত। আমরা ঠিক করলাম ওটাতেই যাব। ভাড়া একটু বেশি লাগে কিন্তু পৌঁছে দেয় তাড়াতাড়ি। দীপেনের কাছে শুনলাম, মাসি যে ঘরের চাবি দিয়েছে ওটাতেই ওরা গেলে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা ডবল বেড খাট আছে। আর একটা ক্যাম্প খাট। দরকার পড়লে ব্যবহার হয়। মশারি, বিছানা, বালিশ সবই আছে। আমরা ভাবলাম ভালই হলো। বেশি মালপত্র আর বইতে হবে না।

অভিভাবকদের অনুমতি পেতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। পলাশের বাবা হাওড়া স্টেশনে রেলের কোনও একটা ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। উনিই আমাদের চারজনের ডিলাক্সের অগ্রিম টিকিট কেটে দিয়েছিলেন মধুপুর পর্যন্ত। আমরা যে যার টিকিট নিজেদের কাছেই রেখেছিলাম। ঠিক হয়েছিল নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের দেখা হবে একেবারে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে। আমার আর ধীরাজের বাড়ি কাছাকাছি ছিল। সেদিন আমরা একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোলাম। ফাঁকা ট্রামে হাওড়া স্টেশন পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। প্লাটফর্মে ঢুকে দেখলাম ট্রেন এখনও আসেনি। ট্রেন ছাড়তে এখনও আধঘণ্টার ওপর বাকি। পলাশটা মহা ভীতু। যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় এই ভয়ে আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল স্টেশনে। আরো মিনিট পনেরো দাঁড়াবার পর ট্রেন ধীরে ধীরে প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। অল্প মালপত্র নেওয়া হয়েছে। এই প্রথম আমরা একা একা চলেছি কলকাতার

বাইরে। মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা মেশানো আনন্দ ঘোরাফেরা করছে।

ট্রেন প্লাটফর্মে দাঁড়াতে আমরা কোচ নাম্বার মিলিয়ে যে যার সিট খুঁজে নিলাম। ট্রেন ছাড়তে কিছুটা দেরি আছে। কিন্তু দীপেনের দেখা নেই। সকলেরই চিন্তা হচ্ছে ওর জন্যে। মধুপুরের চাবি ওরই কাছে। যদি না এসে পৌঁছোয় কি হবে? ভাবতে ভাবতে উদ্বেগ যখন চরমে তখনই হাজির দীপেন। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। ওকে দেখে পলাশ বলে ওঠে, বাবাঃ বাঁচালি আমাদের।

দীপেন ওর সিটে বসে ততক্ষণে ঘাম মুছতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে মাথাতেও হাত বোলাতে দেখলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে যখন প্লাটফর্ম থেকে বেরোচ্ছে, দীপেন বলল, তোরা খুব ভয় খেয়ে গেছলি না রে? কি করব বল? সকালে বেরোতে গিয়ে দেখি বাড়ির সামনে একটি ছেলেকে ঘিরে ধরেছে চার-পাঁচজনে। ছেলেটা পাড়ায় থাকে। আমি চিনতাম। আমায় দেখে ও চেঁচিয়ে উঠল, দীপেনদা আমায় বাঁচান। চারদিকে দেখলাম রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা। সবাই বাড়ির ভেতর থেকে জানলা-দরজা বন্ধ করে উঁকি মেরে দেখছে। ছেলেটার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার শরীরে কিসের যেন একটা ঝিলিক অনুভব করলাম। কে যেন আমার মধ্যে ভর করল। বুঝলাম এরই নাম সাহস। এগিয়ে গেলাম লোকগুলির কাছে। বললাম, কি হয়েছে, সাতসকালে গোলমাল কিসের? আমার কথা শেষ হতে না হতেই একটি ছেলে এগিয়ে আমার থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, গোলমাল তো তোমার কি চাঁদু? ভাল চাও তো চুপচাপ কেটে পড়। এরপর কি যে হলো তোদের কি বলব। জানিস তো রোজই কল্যাণদার কাছে ব্যায়াম করি। সাহসটাও বেশি। থুতনিতে হাত দিতেই সমস্ত জোর শরীরে এক করে ছেলেটার পেটে মারলাম এক লাথি। ওর হাতে ছিল ছোরা। সেটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। অন্যরা এবার ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। তাল বুঝে পাড়ার ছেলেটা দৌড়ে পাশের গলিতে পালিয়ে গেল। ওখানে অনেকগুলো সরু সরু গলি আছে। ও তার মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যাবে বুঝতে পারলাম।

ওরা তোকে ছেড়ে দিল? জিজ্ঞেস করল ধীরাজ।

না রে ভাই। ওদের যত রাগ এসে পড়ল আমার ওপর। সবাই মিলে আমায় ধরতে এল। যেটাকে লাথি মেরেছিলাম শুয়েই পড়েছিল রাস্তায়। তখনও ওঠেনি। আমি প্রাণপণে ওদের ঠেকাতে চেষ্টা করলাম। ওরা তিনজন তো। পেছন থেকে কে একজন মাথায় একটা ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করল। মাথাটা এখনও ব্যথা করছে। আমাকে আঘাত করার পর ওরা সকলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি মাথায় হাত দিয়ে টলতে টলতে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারছি না। একটা ২৪-এ বাস হাতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম ওটাকে ধরবার জন্য। হাওড়ার বাস। কিছুক্ষণ পর দেখলাম হাওড়া স্টেশন এসে গেছে। এইজন্যেই এত দেরি হয়ে গেল।

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর শরীর ঠিক আছে তো?

গায়ে হাতে একটু ব্যথা লাগছে, তবে

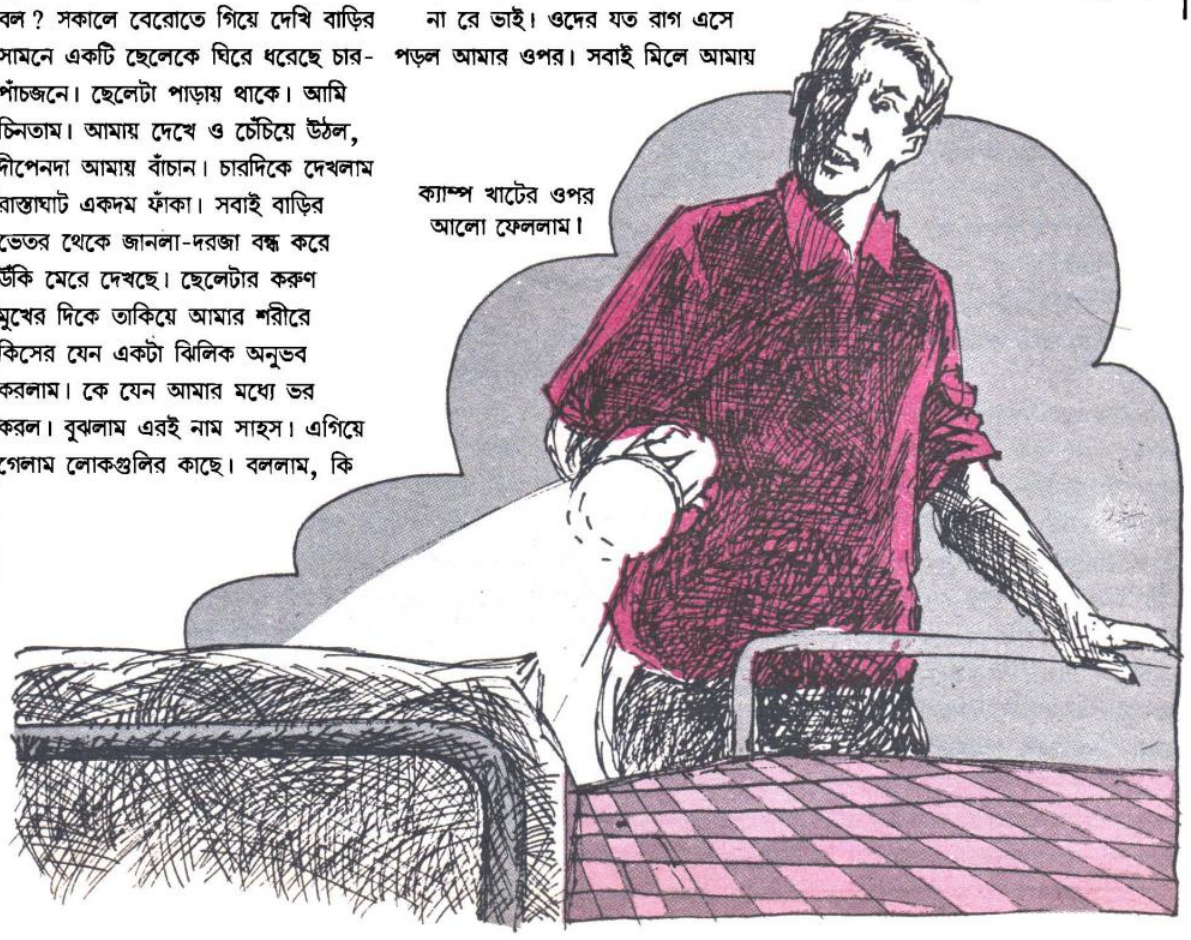

ক্যাম্প খাটের ওপর আলো ফেললাম।

সেরকম নয়। আসলে কল্যাণদার কাছে তো পেশী শক্ত করার কৌশলটা শিখেছিলাম। সেটাকেই কাজে লাগিয়েছি।

সেটা আবার কি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ধীরাজ।

কেউ মারতে এলে যদি পেশীকে সংকোচন করে ফেলা যায়, তাহলে সেটা লোহার মতন শক্ত হয়ে যায়। এর ওপর কেউ আঘাত করলে শরীরের ভিতরের টিসুর কোনও ক্ষতি হয় না। এত করেও মাথাটাকে কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। এখনও ব্যথা করছে।

তোর ব্যাগ, চাবি এগুলো আনতে পেরেছিস তো? চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করে পলাশ।

হ্যাঁ, চাবি আর টিকিট রেখেছিলাম প্যান্টের ভেতরের পকেটে। ওটা চেন দিয়ে আটকানো ছিল। ফলে কিছু ক্ষতি হয়নি। ব্যাগটা অবশ্য ছিঁড়ে গেছে। বলেই এবার হালকাভাবে বলে উঠল, যা ঘটেছে ভুলে যা তো। এখন আমরা যাচ্ছি আনন্দ করতে। বলে গেয়ে উঠল, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে—

আমি বললাম, তোকে তো কখনও গান গাইতে শুনিনি। আজকাল গান গাওয়া ধরলি নাকি?

উত্তর দিল না দীপেন। দাঁত বের করে অস্বাভাবিক ভাবে তাকিয়ে শুধু হাসল।

আড্ডা মারতে মারতে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মধুপুর। স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় চেপে সবাই চললাম দীপেনের মাসির বাড়ি। লোকালয় ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর একটা ছোট মাঠের মধ্যে একটা পুরনো বাড়ি চোখে পড়ল। দীপেন বলে উঠল, এই তো এসে গেছি।

সকলে নেমে পড়লাম রিকশা থেকে। বাড়িটার চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল। অনেকদিনের পুরনো বাড়ি। চারদিকে ঝোপঝাড়ে ভর্তি। আমরা শহরের ছেলে। সাপখোপের ভয় বড্ড। ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে লাগানো গেটটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন মাঝবয়সী রোগা লোক এগিয়ে এল। দীপেন ওকে চিনত। অনেক ছোটবেলায় দেখেছিল। ও কিন্তু দীপেনকে চিনতে পারল না। ওর হাতে চিঠিটা তুলে দিল দীপেন। এবার ও নমস্কার করে বলল, আসুন। আমরা লোকটার পেছন পেছন এগিয়ে গেলাম। একতলা বাড়ি। সামনের ঘরটাতে তালা ঝুলছে। দীপেনের হাত থেকে চাবি নিয়ে লোকটা ঘরটা খুলে দেয়। তারপর বলে, আপনারা বাইরে একটু অপেক্ষা করুন। আমি ঘরটা সাফ করে দিচ্ছি। লোকটা খুব চটপটে। একটু পরেই এসে বলল, হয়ে গেছে। পুরো ঘরটাই ধুয়ে দিয়েছি। এখন আপনারা ভেতরে আসতে পারেন। আমি এর পাশের ঘরটায় থাকি। আপনাদের রান্নাবান্না আমিই করে দেব।

ওর আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিত হলাম আমরা। তারপর ঘরের ভেতর ঢুকলাম। একটা ডবল বেডের খাট পাতা রয়েছে। মালী লোকটা তার ওপর সুন্দর করে বিছানা করে দিয়েছে। তবে এটাতে তিনজনের বেশি শোওয়া যাবে না। ক্যাম্প খাটটাও ঝেড়ে মুছে দিয়েছে। দীপেন সেটাকে দেখিয়ে বলল, আমি এটাতেই শোব। তোরা তিনজনে খাটে শুবি। আমরা রাজী হয়ে গেলাম। মালীকে ভাত আর মুরগীর মাংসর অর্ডার দিয়ে ভাবলাম স্নান-টান সেরে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। বাথরুম ঘরের সঙ্গেই লাগানো। এছাড়া বাড়ির পেছনে প্রায় বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে একটা কুয়োও আছে। দীপেন বলল, আমার কুয়োতে স্নান করতে মজা লাগে। আমি ওখানেই যাচ্ছি। আমি বললাম, তাহলে চল, এবেলা সকলে কুয়োর জলেই স্নান করি। গামছা কাঁধে খালি গায়ে বেরোতে যাব হঠাৎ মালী ছুটে এল। বলল, আপনারা কিন্তু কুয়োর ওদিকে একদম যাবেন না। সাবধান!

কেন? ওদিকে কি সাপ আছে? ধীরাজ জিজ্ঞেস করল।

না সাপ নয়। তবে কিছু একটা আছে। অনেকেই ওখানে গিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। রাতের দিকে কখনই কুয়োর ধারে মুখ ধুতে আসবেন না।

ঠিক আছে, বলে হেসে উঠলাম আমরা। এবার দীপেন বলল, মনে পড়ছে। মাসির সঙ্গে আগে যখন এসেছিলাম তখন মাসিও ওদিকটায় যেতে মানা করেছিল। বলেছিল সেই জমিদারদের সময় কে নাকি ঐ কুয়োয় ডুবে আত্মহত্যা করেছিল।

পলাশ বলে, তুই এসব কথা আগে কেন বলিসনি আমাদের। তাহলে আমি এখানে আসতাম না।

দূর বোকা, দীপেন কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়! এইটুকু রোমাঞ্চ না থাকলে কি ভাল লাগে?

ঠিক বলেছিস। আমি আর ধীরাজ একসঙ্গে বলে উঠলাম।

সবাই এরপর এগোলাম কুয়োর দিকে। একটা বালতি শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। আর পাঁচটা কুয়োর থেকে এটার কোনই তফাৎ পেলাম না। সকলে স্নান করে ফিরে এলাম ঘরে। মালীটা এত দ্রুত কাজ করতে পারে ভাবতে পারিনি। আধঘণ্টার ভেতর আমাদের গরম ভাত আর মুরগীর ঝোলের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা সকলে একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

বিকেল হতেই বেরোবার জন্য ছটফট করে উঠলাম সকলে। দীপেন শুধু বলল, তোরা বেরিয়ে আয়। আমি বাড়িতেই থাকছি। সকালে অনেক ধকল গেছে। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। জ্বর আসতে পারে। রাতের খাবার কথা মালীকে বলে দেব। ঠিক আছে, বলে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত নটা বাজল। মালী ঘরে বসে রান্না করছিল। আমাদের ঘরটা অন্ধকার। দীপেন হয়তো শুয়ে আছে। ওর শরীরটা তো ভাল নেই। দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। ক্যাম্প খাটটা পাতা। আমি ঢুকেই ডাকলাম, দীপেন তোর শরীর ঠিক আছে তো? কিন্তু

কোনও উত্তর দিল না ও। বাধ্য হয়ে ঘরের আলোটা জ্বাললাম। দেখলাম দীপেন ঘরে নেই। হয়তো আশেপাশে কোথাও গেছে ভেবে আমরা খাটের ওপর শুয়ে বসে গল্প করতে লাগলাম। একটু পরেই মালী এসে বলল, রান্না হয়ে গেছে। আপনারা কি এখুনি খাবেন? তাহলে গরম গরম রুটি করে দেব।

আমরা বললাম, দাঁড়াও একটু, দীপেনবাবুকে দেখছি না। ও ফিরে আসুক, তারপর খাব। আচ্ছা, ও কোথায় গেছে তোমায় বলেছে কি?

ওনাকে তো বেরোতে দেখিনি। সন্ধ্যাবেলা বাগানে পায়চারি করছিলেন। আগেই বলেছি বাবু সন্ধ্যের দিকে যেখান-সেখান যাবেন না। আপনারা শহরের ছেলে। এসব বিশ্বাস করেন না।

চল তো সবাই বাগানটা ঘুরে আসি। আমার কথায় পলাশ বলল, দাঁড়া আগে টর্চটা নিই।

টর্চের আলোয় সারা বাগান খুঁজলাম আমরা। রাতের দিকে কুয়োর ধারে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু তিনজনে একসঙ্গে থাকায় চলে গেলাম সাহস করে। কুয়োর সামনে টর্চ ফেলতেই দেখি চারপাশ ঘিরে বাঁধানো জায়গায় কে যেন শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম দীপেন ঘুমোচ্ছে ওখানে। আমি ডাকলাম, এই দীপেন, উঠে পড়। এখানে ঘুমোচ্ছিস কেন? দীপেন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। তারপর বলল, তোরা ফিরে এসেছিস! তোরা চলে যাবার পর ঘরে একদম ভাল লাগছিল না। এখানে বসেছিলাম হাওয়া খেতে। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানি না। ওকে বললাম, তুই তো জানিস রাতের বেলা এদিকটা আসা বারণ।

আরে ছাড় তো ওসব। ভয় করলেই ভয়, না করলে জয়। এ কথাটা মনে রাখবি সব সময়।

দীপেন কি একটু বদলে গেছে? গান গাইছে। কবিতা বলছে। মাথায় আঘাত লেগে মাথার কিছু গোলমাল হয়নি তো? এবার উঠে আমাদের সঙ্গে ফিরে এল ও। রাতের খাবার ছিল গরম রুটি আর ঘুগনি। খেয়ে শোবার তোড়জোড় করছি, দীপেন বলল, তোরা শুয়ে পড়। আমি একটু পরে ঘুমোচ্ছি। সারা সন্ধ্যে ঘুমিয়ে এখন আর ঘুম পাচ্ছে না। বলে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি আজ সকালের ঘটনাটা ও মন থেকে মুছতে পারছে না। মনটা এখনও অশান্ত হয়ে রয়েছে। তাই ঠিকমতো বসতে, শুতে পারছে না। ঘুমেরও কোনও ঠিক নেই। আমি বললাম, বেশি দেরি করবি না কিন্তু।

ঠিক আছে।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি, ধীরাজ আর পলাশ পাশাপাশি শুয়ে। মাথার কাছে টর্চ রাখা আছে। দীপেন সাহসী ছেলে। একটু পরে ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়বে জানি।

মাঝরাতে একবার বাথরুমে যাওয়া আমার অনেকদিনের অভ্যাস। রোজকার মতো আজও ঘুম ভেঙে গেল। হাতঘড়িতে সময় দেখলাম। রাত দুটো বাজে। বাথরুমে যাব বলে বিছানা থেকে নামলাম। তারপর বাথরুমের আলো জ্বেলে ভেতরে গেলাম। সবাই এখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বাথরুম থেকে ফেরবার সময় কি হলো, হঠাৎ চোখটা চলে গেল ক্যাম্প খাটের দিকে। আরে দীপেন তো নেই! এত রাতেও শুতে আসেনি? গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। একটা অদৃশ্য টান অনুভব করলাম। বিছানা থেকে টর্চটা নিয়ে ওর ক্যাম্প খাটের ওপর আলো ফেললাম। না খাটে যে কেউ শুয়েছিল তার কোনও চিহ্নই নেই। ঘরের বাইরে এলাম। কে যেন আমাকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে চলেছে। পলাশ আর ধীরাজকে ডাকা হলো না। দূর থেকে টর্চ ফেললাম কুয়োর পাড়ে। কী আশ্চর্য! দীপেন এত রাতে কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে কি যেন দেখছে। চিৎকার করে উঠলাম আমি, দীপেন এদিকে আয়। কুয়োর ভেতর পড়ে যাবি যে।

আমার কথায় ও হেসে উঠল হো হো করে। বলল, তুই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। এদিকে আর এগোবার চেষ্টা করিস না। বিপদ হবে।

ওর কথায় থমকে গিয়ে ফিরে এলাম ঘরে। দীপেনের খাটের ওপর আবার টর্চের আলো ফেললাম। কি হলো? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওই তো দীপেন খাটে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সবটাই কি তাহলে আমার মনের ভুল? ভাবতে ভাবতে পাশের খাটে শুয়ে পড়লাম আবার। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে ধীরাজ আর পলাশ। বাকি রাতটুকু ঘুম হলো না ভাল করে। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে চোখ চলে গেল দীপেনের খাটের দিকে। বিছানা ফাঁকা। দীপেন ঘরে নেই। শুধু তাই নয়। কাল ঠিক বিছানার অবস্থা যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে। অর্থাৎ বিছানা একদম পরিষ্কার। কেউ এটাকে ব্যবহার করেছে বলে মনে হয় না। ধীরাজ ও পলাশকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম এবার। তিনজনে মিলে খুঁজলাম ওকে। না কোথাও নেই। রাতের ঘটনা খুলে বললাম ওদের। কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। মালীটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি দীপেনবাবুকে দেখেছো?

বাবু তো ভোরবেলা বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলল আসতে দেরি হবে। ওদের খেয়ে নিতে বোলো।

আজ আর কারোরই বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। দীপেন কি কোনও বিপদে পড়েছে? গুণ্ডাদের কেউ কি ওর পিছু নিয়েছে? আমরা চিন্তা করব বলে হয়তো আমাদের কিছু বলছে না। ভাবতে ভাবতে পুরো সকালটাই কেটে গেল। চা খেলাম অনেক দেরিতে। বেলার দিকে মেন গেটের কাছে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হলো। গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন এক ভদ্রমহিলা। প্রাইভেট কারে এসেছেন। মালী ছুটে গেল ওনাকে দেখে। ওর গলায় বিস্ময়, আরে বৌদি আপনি?

আপনার বোনপো তো কাল এই তিনজন বন্ধুদের নিয়ে এখানে এসেছেন।

কি বললে?

হ্যাঁ, দীপেনবাবু কাল ওনাদের নিয়ে এখানে এসেছেন। আমাদের দিকে হাত দেখিয়ে আবার বলল মালী।

ততক্ষণে আমরাও গিয়ে পড়লাম ওনার সামনে। আমাদের দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, দীপেন...দীপেন আসবে কোথা থেকে? কয়েকদিন আগে ও আমার কাছ থেকে এ বাড়ির চাবি নিয়ে এসেছিল। গতকাল এখানে আসবার কথা ছিল। বলেই কেঁদে ফেললেন ভদ্রমহিলা।

কি হলো আপনি কাঁদছেন কেন? এবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

একটু সামলে ভদ্রমহিলা বললেন, ও তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে বলে বেরিয়েছিল। বাড়ির সামনে পাড়ার একটা ছেলেকে অন্য পার্টির ছেলেরা খুন করতে যাচ্ছিল। ও ছেলেটাকে বাঁচাতে যায়। বাঁচিয়েও দেয়। ছেলেটা পালিয়ে যায়। কিন্তু ও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। ওর মাথায় পেছন থেকে কেউ একজন রডের আঘাত করে খুব জোরে। তারপরেই পালিয়ে যায় ওরা। অত জোর আঘাতেও ওর মাথাটা কিন্তু ফেটে যায়নি। ওই অবস্থাতেই ও মাথায় হাত দিয়ে একটা ২৪-এ বাসে উঠে পড়ে। ওটা হাওড়ার বাস ছিল। মাথার ভেতর রক্তক্ষরণে ওর মৃত্যু হয় বাসেরই মধ্যে। ওর বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে যোগাযোগ করা হয়। তাইতে জানা যায় যে তোমরা মধুপুরে এসেছো।

কিন্তু কাল যে দীপেনবাবু আপনার চিঠি দেখাল। সেটা এখনও আমার পকেটে আছে। বলে ওঠে মালী।

চিঠিটা তো অনেক আগে দিয়েছিলাম। কিন্তু কাল ও কেমন করে চিঠি দেবে? ও তো তার আগেই—দেখি, দেখাও তো চিঠিটা?

এই তো দেখুন না।

কাগজটা বের করে মালী। খুলে পড়াতে থাকে মাসিকে। আমরাও ঝুঁকে পড়লাম ওটা দেখতে। ঠিকই তো। মাসির কয়েকদিন আগের লেখা চিঠি। মারা গিয়েও দীপেন পৌঁছে দিয়েছে এখানে শুধু আমাদের সুবিধের জন্য। পলাশ হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা ওর ব্যাগটা ঘরে ছিল। এখনও আছে কিনা দেখেছিস কেউ?

ঠিক বলেছিস। চল তো দেখি। আমার কথায় সবাই এলাম ঘরে। এক কোণে পড়ে রয়েছে ব্যাগটা। ভেতরে কি আছে দেখবার জন্য খুলতেই দেখলাম একদম ফাঁকা ব্যাগ। জামাকাপড় কিছুই নেই। শুধু একটা খাম পড়ে আছে। খামটা বের করে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চিঠি। দীপেনেরই হাতের লেখা। ওতে লেখা রয়েছে—

বন্ধুরা,

তোরা আমায় ক্ষমা করিস। মৃত দীপেন জীবিতের রূপ ধারণ করে তোদের সঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছিল। নইলে তোদের সমস্ত আনন্দ নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আর পারলাম না এই দেহ ধারণ করে থাকতে। এটা যে কি কষ্টের তোদের বোঝাতে পারব না। এখানে এসে কুয়োর ধারে আরো একজন অশরীরী বন্ধুর দেখা পেয়েছি। ওরই জন্য বারবার ছুটে গেছি কুয়োর ধারে। কাল সন্ধ্যের সময় আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে। ও বহুদিন আগে এই কুয়োয় পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। ও আর আমি এখন এই জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছি অনেক দূরে। তাই এ বাড়িতে কুয়োর ধারে আর কাউকে কোনওদিন দেখা যাবে না।

আমি দীপেনের মাসিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে এলেন কেন হঠাৎ?

মাসি বললেন, কাল সকালে একটা টেলিফোন এল। দীপেনের গলা। আমায় বলল, মাসি প্লিজ—তুমি যত তাড়াতাড়ি পার একবার মধুপুর চলে যাও। আমার বন্ধুরা সবাই ওখানে বড়ই বিপদে আছে। বলার পরই কেটে গেল ফোনটা। তারপর আমি দীপেনের খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলাম ওর মৃত্যুর খবর। কি আর করা যাবে। এসে যখন পড়েছো এখানে দু-একদিন কাটিয়ে যাও।

মাসির কথায় রাজী হতে পারলাম না। দীপেনকে বাদ দিয়ে কি থাকা সম্ভব! মাসির সঙ্গে সেদিনই রওনা হলাম আমরা।

দীপেনের চিঠিটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। এটাই ওর শেষ চিঠি, স্মৃতি হয়ে থাকবে আমাদের সঙ্গে।

ঠিক করলাম কলকাতায় ফিরে চিঠিটা বাঁধিয়ে রাখব। কলকাতায় এসে পরদিনই সন্ধ্যেবেলা গেলাম আমাদের পাড়ার একটা বাঁধাইয়ের দোকানে। চিঠিটা বের করে দোকানের মালিকের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা বাঁধাতে কত লাগবে দাদা? পলাশ আর ধীরাজ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক হাত থেকে কাগজটা নিয়ে খুলে দেখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন?

ভাল করে ভেবে দেখুন। অন্য কোনও কাগজ বাঁধাতে গিয়ে এটার সঙ্গে ভুল করছেন না তো! বলে কাগজটা ফেরৎ দিলেন আমার হাতে।

কাগজটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। কী আশ্চর্য! কাগজে কিছুই লেখা নেই। সব ভ্যানিশ। একটা ভৌতিক স্মৃতি নিয়ে ধীরাজ, পলাশ ও আমি ফিরে গেলাম নিজেদের বাড়িতে।

ছবি: রঞ্জন দত্ত

ঋণ পরিশোধ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ট্রেনটা ছাতনা স্টেশনে এসে যখন থামল তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে বারোটা। অর্থাৎ দু'ঘণ্টা লেট। রামমোহনবাবু ছোট্ট সুটকেসটা নিয়ে ধীরেসুস্থে নামলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন। নাঃ, গোরুর গাড়ি তো দূরের কথা একটা কুলি পর্যন্ত নেই। গোটা স্টেশনটা খাঁ খাঁ করছে। ট্রেনটা ধুঁকতে ধুঁকতে একটু আগেই চলে গেছে। মরা চাঁদের আলোয় লাইনগুলো ধূসর রঙের অজগরের মতো দেখাচ্ছে। স্টেশনটাও রহস্যময়। দূরে দেখা যাচ্ছে টিকিটঘরটা। তার পাশেই স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বিশাল দৈত্য কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রামমোহনবাবু সেদিকেই পা বাড়ালেন। দূর থেকে কোয়ার্টারটাকে পুরোপুরি অন্ধকার মনে হলেও কাছে যেতেই দেখলেন ঘরের ভেতর একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। স্টেশন মাস্টার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

রামমোহনবাবু এগিয়ে গেলেন। ডাকবেন কিনা ভেবে একটু দ্বিধা করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ও মশাই, শুনছেন? এখানে কোনো যানবাহন পাওয়া যাবে?

স্টেশন মাস্টার সমানে নাক ডাকছেন। এত গভীর ঘুমে ওরকম চিঁহি চিঁহি স্বরে ডাক একেবারে বেমানান ভেবে রামমোহনবাবু এবার গলা চড়ালেন। লোকটার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়ে চড়া গলায় বললেন, এই যে মশাই, শুনছেন? বলি, এখানে কোনো যানবাহন পাওয়া যাবে?

লোকটা বোধহয় এবার শুনতে পেয়েছে। নাসিকা গর্জন থেমে গেছে। চোখ পিটপিট করে রামমোহনবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর তাঁকে চমকে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রুক্ষস্বরে বলল, বড় যে গোঁত্তা মারছিলেন! বলি, হয়েছেটা কি? আপনাদের জ্বালায় একটু ঘুমোনোও যাবে না। বলি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেনটা কি? তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন না কথাটা, নাকি বাক্যি হরে গেল?

রামমোহনবাবু লোকটার ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গেছেন। ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, না—মানে—মানে বলছিলাম কি—

লোকটা রামমোহনবাবুর কথার মাঝখানেই ধমকে উঠল। কণ্ঠস্বর একধাপ চড়িয়ে বলল, আরে মশাই, আপনার ভ্যানতাড়া এখন ট্যাঁকে গুঁজে রাখুন। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বাবু এখন ভূমিকা করছেন এক ঘণ্টা ধরে। নাঃ, কালই আমি রিজাইন দিয়ে দোব। ঘুমের সাধনা এক বিরাট সাধনা। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ

করা বড় কঠিন। একমাত্র সিদ্ধিলাভ করেছিলেন গুরুদেব কুম্ভকর্ণ। আমারও ইচ্ছে আছে। কিন্তু এভাবে ডিসটার্ব করলে কেউ বাঁচে নাকি? এই যে মশাই, বলুন কি বলছিলেন?

রামমোহনবাবুর তোতলামি ভাবটা এখনও কাটেনি। বললেন, তে-তেমন কিছু নয়। মানে কো-কোনো যানবাহন পাওয়া যেতে পারে কি? আ-আমি কামারকুলি যাব।

লোকটা এবার অবাক হয়ে চাইল। বলল, বলেন কি মশাই? এই গভীর রাতে যানবাহন? আপনি পাগল নাকি? আজ আর কিসসু হবে না। কাল সকালে বলেন তো একটা গোরুর গাড়ি যোগাড় করে দিতে পারি। এখন মানে মানে কেটে পড়ুন দিকিনি।

রামমোহনবাবু হতাশ হলেন। লোকটার দিকে আর এক পলক তাকালেন। ততক্ষণে সে দ্বিতীয় দফা ঘুমোবার আয়োজন করছে। রামমোহনবাবু বেরিয়ে এলেন। পিছনে তখন আবার নাসিকা গর্জন শুরু হয়ে গেছে। ফরর্-ফোৎ, ফরর্-ফোৎ।

তিনি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন সোজা পশ্চিমমুখে। হাঁটা ছাড়া আর কিই বা উপায় আছে? বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। কোথা থেকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে। সম্ভবত কাছাকাছি কোনো সুগন্ধি ফুলের গাছ আছে।

রামমোহনবাবু একটা প্রাইভেট কোম্পানির সেলস ম্যানেজার। বেশ মোটা মাইনের চাকরি। কিন্তু যখন-তখন যেখানে-সেখানে যেতে হয়, এই যা অসুবিধে। এবার ছাতনায় পাঠিয়েছে। এক মাসের জন্য একটা বাংলো বাড়ি কোম্পানিই ঠিক করে দিয়েছে। ওখানেই থাকতে হবে এ কটা দিন। এজন্য অবশ্য তিনি বাড়তি টাকাও পাবেন। ওখান থেকে কয়েকটা মাল সাপ্লাই করতে হবে।

একদিক দিয়ে চাকরিটা খুবই ভালো। কিন্তু ঐ যা একটি অসুবিধে—বছরের এগারোটা মাসই বিদেশে-বিভুঁইয়ে কাটাতে হয়।

চার বছর আগেও একবার ঐ বাংলোতে মাস দুয়েক কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। সেবারও এই একই কাজের জন্য তাঁকে কোম্পানি থেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেবার এমন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। গোরুর গাড়ি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

রামমোহনবাবু হাঁটতে লাগলেন। রাস্তাটা বেশ এবড়ো-খেবড়ো। এখনও পাকা হয়নি। মাঝে মাঝে পাথর বেরিয়ে আছে। যেন নাক উঁচিয়ে উঁকি মারছে। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। টর্চটাও আনতে ভুলে গিয়েছেন এবারে। রাস্তার দু'পাশে বেশ ঘন ঝোপঝাড়। রামমোহনবাবু সাবধানে হাঁটতে লাগলেন। সাপখোপ ওৎ পেতে নেই তো? এখনও পর্যন্ত একটা লোকেরও দেখা পাননি। অবশ্য না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। রাত একটায় গ্রাম্য রাস্তায় লোকের দেখা পাওয়াটাই আশ্চর্যের। বাংলোর বুড়ো দাসবাবু আবার জেগে আছে তো? ঘুমিয়ে পড়লে আর এক ঝকমারি। দাসবাবু কানে শোনেও কম। ঘুমিয়ে পড়লে ডাকাডাকি করেও কোনো ফল হবে না। তাহলে কি হবে? ভাবতেই গা শিউরে উঠল রামমোহনবাবুর। তাহলে তো রাতটা গাছের তলাতেই কাটাতে হবে। বাংলোটা একটা ছোট্ট টিলার ওপর। আশে-পাশে কোনো ঘরবাড়ি নেই। কাজেই মানুষের সাহায্য পাওয়ার আশাও নেই।

ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন রামমোহনবাবু। হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে চমকে উঠলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এখানটায় দু'দিক থেকে দুটো রাস্তা এসে মিশেছে। যুক্ত চিহ্নের মতো আড়াআড়িভাবে ক্রশ করেছে একে অপরকে। তাই এখানটাকে লোকে চৌমাথার মোড় বলে। ডাইনে যে রাস্তাটা গৌরীপুরের দিকে চলে গেছে সেদিকে তাকালেন। একটা আলো দুলতে দুলতে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। লণ্ঠনের আলো। গোরুর গাড়ি একটা। চাকাগুলোয় তেল দেওয়া হয়নি। অনেকদিনের তৃষ্ণার্ত। আর্তনাদ করছে তাই বিকটভাবে। রামমোহনবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। যদি এ গাড়িটা ওদিকে যায় তবে চেপে যাবেন তিনি। এখনও অনেকটা পথ।

আলোকবিন্দুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একেবারে কাছে এলে লণ্ঠনের আলোয় গাড়ির চালকের মুখ দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। কে? নিমাই নাকি?

আপনি? ইখানে? নিমাইয়ের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

হ্যাঁ, আবার আসতে হলো। এবার এক মাস থাকব। রামমোহনবাবু হেসে বললেন।

বৃদ্ধ নিমাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, চাপেন, চাপেন। গাড়িতে চাপেন। এতটা পথ আঁধারে হাঁটে আলেন। একটা খবর দিতে পারতেন। আমি গাড়ি লিয়ে ইস্টিশানে দাঁইড়ে থাকতাম।

রামমোহনবাবু গাড়িতে চাপলেন। ন্যাড়া গাড়ি। মাথার ওপর কোনো আচ্ছাদন নেই। সুটকেস পাশে রাখতে রাখতে বললেন, এবার তো আমিই জানতে পারিনি। যাই হোক, এতক্ষণে তোমাকে পেয়ে একটু আরাম পেলাম। ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া এতটা পথ হেঁটে গেলে আমার পা দুটোই অবশ হয়ে যেত। তা তুমি এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

এদিকপানে একডা নদী আছে না? উখান থিকে বালি লিয়ে গেছলম গাঁয়ে।

তোমার ছেলে এখন কি করছে?

এখন ঐ কাজটাই করছে বাবু। আপনি যে কাজটা করে দিইছিলেন। এখন উ সদ্দারের পোস্টটা পায়েছে। টাকাও ভালই পায়।

রামমোহনবাবু লণ্ঠনের আলো থেকে চোখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালেন। কালো কালো গাছগুলো একটার পর একটা আস্তে আস্তে পার হয়ে যাচ্ছে। রামমোহনবাবু সেদিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে

কি হয়েছে বাবার ?

ভাবতে লাগলেন চার বছর আগের সেই দিনটার কথা।

সেদিন ট্রেনটা রাত সাড়ে দশটাতেই এসে পৌঁছেছিল। স্টেশনে নেমেই দেখতে পেলেন একটা গোরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে। তিনি এগিয়ে যেতেই গাড়ির চালক সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, আসেন বাবু, আমার গাড়িতে আসেন। আমি আপনারই জন্যে দাঁইড়ে আছি।

তোমাকে পাঠাল কে ? রামমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

হুই যে, বাংলোর বুড়া দাসবাবু। উনিই তো বললেন আজ আপনি আসবেন। তাই আমাকে পাঠাই দিলেক।

রামমোহনবাবু বেশ আনন্দিত হলেন। গোরুর গাড়িতে এই প্রথম চাপছেন বলে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। কথায় কথায় জানতে পারলেন লোকটার নাম নিমাই। একটিই ছেলে, কিন্তু বেকার। দু'বেলা ভালো করে খেতে পর্যন্ত পায় না ওরা। শুনে রামমোহনবাবু নিমাইকে বললেন তিনি তার ছেলের একটা চাকরি করে দেবেন। নিমাই দারুণ খুশি হলো। বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল রামমোহন-বাবুকে। পরে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ওর ছেলেকে একটা প্রাইভেট ফার্মে ঢুকিয়ে দিলেন।

তারপর বাংলোতে যে ক'টা দিন ছিলেন নিমাই রামমোহনবাবুর সব কাজ করে দিত। তখন জলের খুব কষ্ট ছিল। নিমাই কাঁধে করে জল এনে দিত। বাংলোর চারদিকের গ্রামগুলো আর পিছনের বনটা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছিল সে। চার বছর পরে আবার আজ এই বিপদের দিনে সেই নিমাই-ই তাঁকে উদ্ধার করল।

হঠাৎ নিমাইয়ের গলার আওয়াজে রামমোহনবাবুর চিন্তা ভঙ্গ হলো। বৃদ্ধ নিমাই বলল, পৌঁহুছে গেছি বাবু। হুই দেখেন বাংলোয় এহনও আলো জ্বলতিছে। বুড়া দাসবাবু এহনও জাগে আছে তাইলে।

নীল আলোটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। এটিই দাসবাবুর নীল সাইন। এটি যতক্ষণ জ্বলবে ততক্ষণই সে জেগে থাকবে। ভাগ্যটা আজ খুব ভালো বলতে হবে। দাসবাবু এখনও জেগে আছে। নইলে একটা কেলেঙ্কারি হতো। দাসবাবুর ঘুম ভাঙাতেই নিশ্চয় ভোর হয়ে যেত।

বাংলোর বেশ খানিকটা দূরে নিমাই গাড়ি থামাল। বলল, আমি আর যাব নাই বাবু। আজ বেশ রাত হয়ে গেল। আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবেক।

রামমোহনবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে সেটা বাড়িয়ে দিলেন নিমাইয়ের দিকে। বললেন, এটা ধরো। আজ তুমি না থাকলে আমার কি হতো ভাবতেই ভয় লাগছে। এটা তোমার সাহায্যের বদলে সামান্য পুরস্কার।

নিমাই হাতজোড় করে জিভ কেটে বলল, আর লজ্জা দিবেন নাই বাবু। আপনি আমার যা উপকার করেছেন তা আমি চিরকাল মনে রাখব। আপনার কাছে আমিই ঋণী। আজকের এই সামান্য সাহায্যটুকু মনে করবেন সেই ঋণের কিছুটা পরিশোধ।

শেষটায় নিমাইয়ের গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত শোনাল।

রামমোহনবাবু অবাক হয়ে গেলেন নিমাইয়ের মুখে অমন সুন্দর কথা শুনে। টাকাটা পুরে ফেললেন পকেটে। নিমাই ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে। রামমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে থেকে সে বলল, নমস্কার বাবু, চললুম।

গাড়িটা নড়বড় করতে করতে আর

বিশ্রীরকম শব্দ ছাড়তে ছাড়তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রামমোহনবাবু বাংলোর পথে পা বাড়ালেন। একটা সন্দেহ তাঁর মাথায় কাঁটার মতো খচখচ করছে। নিমাই বাংলো থেকে অতদূরে তাঁকে নামিয়ে দিল কেন? শুধু কি বাড়ি যাওয়ার তাড়াহুড়োতেই? আগের বারেও তো এসেছিলেন ওর গাড়িতেই। তখন বাংলোর ভিতর পর্যন্ত লটবহরগুলো পৌঁছে দিয়েছিল। আবার ওর শেষ কথাগুলো—বিশেষ করে ঐ 'ঋণ পরিশোধ' কথাটা কেমন যেন অন্যরকম লাগল।

রামমোহনবাবু ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলেন। বাংলোর সদর দরজা বন্ধ। এটাই আশা করেছিলেন তিনি। যে জানালা দিয়ে আলো দেখা গিয়েছিল, সেটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন বৃদ্ধ দাসবাবু পিঠ ঘুরিয়ে বসে আছে। মাথাটা টেবিলের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে রয়েছে।

রামমোহনবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, ও দাসবাবু, আমি রামমোহন। দরজা খুলুন। আমাকে কোম্পানি থেকে পাঠিয়েছে।

দাসবাবু চোখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। ঠাহর করেই চিনতে পারল রামমোহনবাবুকে। আরে আসুন, আসুন। এতদিন পরে এলেন! আমি তো এতক্ষণ আপনারই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে বলল, এত রাত হয়ে গেল যে? ফোনে একটু আগে খবর পেলাম আপনি আসছেন। কিন্তু এত রাত্রে স্টেশনে কে যাবে বলুন?

রামমোহনবাবু হাসলেন। ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট। সে এক কেলেঙ্কারি মশাই। যাক, এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত। একটু শুতে পেলে বাঁচি। আজ আর খাব না।

খাবেন না? তাহলে তো আমাকে বাঁচালেন মশাই। এতক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে ঘুমে চোখ দুটো একেবারে লটপট করছিল। যান, যান। শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সব কথা হবে।

দাসবাবু তার ঘরে ঢুকে গেল। রামমোহনবাবু ধীর পায়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভোর চারটেয় ঘুমটা ভেঙে গেল। ভোরে ওঠা রামমোহনবাবুর চিরকালের অভ্যাস। হাই তুলে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন তিনি। জামাটা গায়ে চাপিয়ে চপ্পল দুটো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভোরে বেড়ানো যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত উপযোগী তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তিনি। পথ হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল। চারদিক এখনও ভালো করে পরিষ্কার হয়নি। গাছপালা ঝোপঝাড় সবই অস্পষ্ট। বেশ কিছুটা এগিয়ে ডানদিকের রাস্তাটা ধরলেন তিনি। পথটা নদীর দিকে চলে গেছে। কিছুটা এগিয়েই দূরে কয়েকটা কালো ছায়ামূর্তি তাঁর নজরে পড়ল। এদিকেই এগিয়ে আসছে। চোরটোর নয় তো? ধাঁ করে মনে পড়ে গেল, আরে, এটা তো শ্মশানের রাস্তাটা। নদীর ধারেই তো শ্মশান। বোধহয় এরা মড়া পুড়িয়ে আসছে। পথের একধারে সরে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েকজন পেরিয়ে গেল। প্রত্যেকেরই গা খালি, কোমরে গামছা। একজন কাঁপতে কাঁপতে তাঁর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। রামমোহনবাবু ছেলেটার দিকে এক পলক তাকালেন। তাকিয়েই চিনতে পারলেন। আরে নিতাই নাকি?

হ্যাঁ বাবু, আমি। নিতাইও চিনতে পেরেছে।

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরটা রামমোহনবাবুর কানে করুণ ঠেকল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে এত ভোরে?

এবার নিতাই কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আর কি বলব বাবু? বাবা—কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

রামমোহনবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বাবার?

কান্নাভেজা গলায় নিতাই বলল, বাবা কাল সন্ধ্যায় মারা গেল বাবু। তিন মাস ধরে বিছানায় পড়েছিল। ক্যানসার হলে কি মানুষ বাঁচে?

মনে হলো হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ যেন রামমোহনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। নিথর হয়ে গেলেন তিনি।

যাই বাবু। পরে আপনার বাংলোতে যাব। নিতাই বিদায় নিয়ে গুটি গুটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হলো।

রামমোহনবাবু তখনও নিশ্চল। সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁর চোখের ওপর দুলছে। মাঝে মাঝেই চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে নিমাইয়ের মায়াবী মুখখানা। টলে পড়ছিলেন তিনি। নিজেকে সামলে নিলেন কোনোমতে। মাতালের মতো এলোমেলো পা ফেলে বাংলোর দিকে চলতে লাগলেন। মাথার মধ্যে তখন বারবার ধ্বনিত হচ্ছে বৃদ্ধ নিমাইয়ের শেষ কথাটা—

'আজকের এই সামান্য সাহায্যটুকু মনে করবেন সেই ঋণের কিছুটা পরিশোধ।'

ছবিঃ দিলীপ দাস

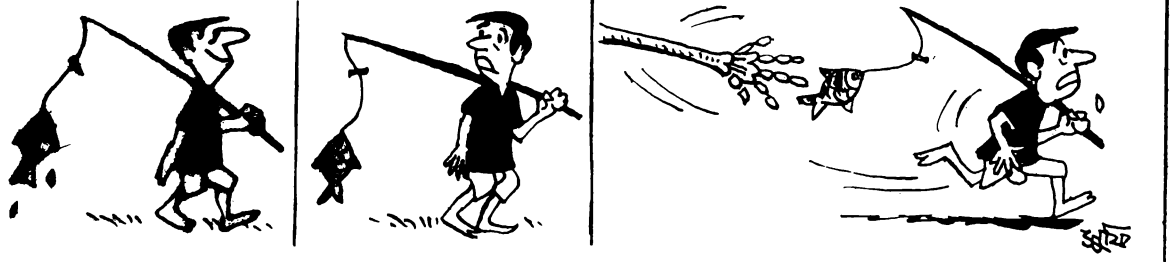

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

ট্রেভর বেইল্‌স

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে...' ট্রেভর বেইলস্‌ কি বিশ্বকবির এই কবিতা পড়েছিলেন? না পড়লেও একলা চলার মতোই গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন ক্লক-ওয়ার্ক রেডিও। যা এডস-এর মতো কালান্তক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য তিনি তৈরি করেছেন অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। এই রেডিও এখন তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে প্রতি মাসে দু'লক্ষেরও বেশি। এজন্য তিনি কোনো টাকা-পয়সাও পাচ্ছেন না বা নিচ্ছেন না। কারণ সস্তায় এই রেডিও আফ্রিকার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য, যাতে অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝেই এডস সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে সকলে সচেতন হয়। এই রেডিওর বৈশিষ্ট্য এতে কোনো ব্যাটারি লাগে না। দম দেওয়া ঘড়ির মতোই এই রেডিও চলে। ফলে আপামর সবাই এই রেডিও ব্যবহার করতে পারবে। এজন্য তিনি পেয়েছেন ব্রিটিশ সরকারের প্রেসিডেন্সিয়াল গোল্ড মেডেল। তিনি ভারতে এসেছিলেন অতি সম্প্রতি। জানিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যে বাজারে আসবে তাঁর এক নতুন আবিষ্কার। চলার সময় পায়ের চাপে জুতোর খোলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সোলের মধ্যে থাকা তাঁর বিশেষ যন্ত্র সেই শক্তি দিয়েই মোবাইল ফোনের ব্যাটারিকে শক্তি যোগাবে। ফলে এখন পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে মোবাইলে কথা বলা যাবে।

উল্কাপাতে তৈরি বেড়ানোর জায়গা

উল্কাপাতে যে গহ্বর তৈরি হয় তাকে বলে ক্রেটার। মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় এরকমই একটি ক্রেটার—লোনার ক্রেটার। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম এই ক্রেটার ব্যাসাল্ট পাথরে উৎপন্ন হয়েছে। একশ পঞ্চাশ মিটার গভীর এবং আঠারশ তিরিশ মিটার ব্যাসযুক্ত এই ক্রেটার সম্ভবত তিরিশ বছর আগে কোনো উল্কার তীব্রগতিতে পতনের ফলেই উৎপন্ন হয়েছিল বলে ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। ক্রেটারটির চারপাশে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন পুরু কাচে মোড়া। এই কাচের সঙ্গে চাঁদ থেকে আনা কাচের অনেক মিল পাওয়া গেছে। প্রথমে কিন্তু পুরো ক্রেটারটির অস্তিত্ব বোঝা যায়নি। কেবলমাত্র তিনটি গর্ত ছিল। পরে ভূ-বিজ্ঞানীরা সেই তিনটি গর্তের মুখ পরিষ্কার করতেই বিশাল ক্রেটার-এর মুখ বেরিয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের মতে ষাট মিটার ব্যাসার্ধযুক্ত কমপক্ষে দুই মিলিয়ন টন ওজনের কোনো উল্কাপিণ্ডের প্রচণ্ড গতিবেগের আঘাতেই এই ক্রেটার তৈরি হয়েছিল। আরো মজার ব্যাপার উল্কাপিণ্ডটি ক্রেটার-এর কেন্দ্রে নেই। পিণ্ডটি গহ্বরের দক্ষিণ-পশ্চিমে দেড়শ মিটারেরও গভীরে প্রোথিত। এখন দর্শনার্থীদের সেই উল্কাপিণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন।

ছবিঃ সরোজ সরকার

সেই অদ্ভুত বাড়িটা

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

গরমের ছুটি পড়ে গেলেই মনটা আইঢাই করে। কিন্তু এই উদ্ভট গরমে কোথায় বা যাওয়া যায়? দার্জিলিং বা সিমলা ঘুরে এলে কেমন হয়? কিন্তু সে যে বড্ড দূর! তাহলে ঘরের কাছে দীঘার সৈকতই বা মন্দ কি?

সোমেনকে বলতেই সে হৈ হৈ করে উঠলো, কেন, আমার মামারই তো দীঘাতে একটা বাড়ি আছে। চল না, ওখানে গিয়ে উঠি। মামারা তো গরমের ছুটিতে মুম্বাই যাচ্ছে।

তাই নাকি? একরকম লাফিয়ে উঠলাম। বলবি তো? এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

সোমেন মিটমিটিয়ে হাসছে। কিন্তু কি করে প্রোগ্রামটা সেট করি বল তো?

কেন, মামার ফোন নম্বর তোর কাছে নেই?

তা অবিশ্যি আছে।

তুই একটা কাজ কর। ইমিডিয়েট মামাকে চিঠি লিখে দে। বল যে আমরা দু'জন গরমের ছুটিতে দু'তিন দিন দীঘা ঘুরে আসতে চাই। সঙ্গে যাবে বাবা ও মা। তোমরা কবে মুম্বাই রওয়ানা হচ্ছ এবং ক'দিন পরে ফিরবে জানাবে। আমাদের স্কুলে আগামী ২২ মে গরমের ছুটি পড়ছে। আমরা ২৪ তারিখে দুপুর নাগাদ দীঘায় পৌঁছাতে পারি।

সোমেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

এতে হাসির কি হলো? অবাক চোখে আমি বলি। সোমেন বলে, বাবাকে তো বলা হয়নি। পারমিশান পাবো তো? আর বাবা-মা এই গরমে বাড়ি থেকে বেরুতে চাইবে বলে তো মনে হয় না।

চিন্তায় পড়লাম। হ্যাঁ, বাধা দেওয়াই তো বাবাদের চিরকালের স্বভাব। আমার বাবা আবার কি বলে? পরক্ষণেই ফের চিন্তামুক্ত হলাম। নিশ্চয়ই না করবে না, সোমেনের মা-বাবা যদি যান। আর ওর মামাবাড়িতে থেকে দীঘার ঝাউবনে ঘুরে ঘুরে বেশ মজা করা যাবে। সাহস দিয়ে কবুল করলাম, আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ। অবনকাকুকে বোঝানোর দায়িত্ব আমি নিলাম। তুই কাকীমাকে রাজী করা তো। কাকীমাও বোধহয় রাজী হয়ে যাবেন।

সর্বাগ্রে সোমেনের মা রুমা কাকীমার কাছেই আর্জি পেশ করলাম। কাকীমা শুনে তো থ। মামা তো বড় একটা ঐ বাড়িতে থাকে না। তাছাড়া পুরনো কেনা বাড়ি। কবেকার কোন আমলের...বলতে বলতে হঠাৎ যেন থেমে গেলেন কাকীমা।

সোমেন দ্রুত বলে উঠলো, পুরনো তো কি হয়েছে? তুমি সেদিন বললে না, তাপু দীঘায় একটা বাড়ি কিনেছে। লজ করবে। অবসর সময়ে থাকবেও ওখানে। তবে কি মামীমা, পিক্‌লুরা ওখানে যায়নি?

রুমা কাকীমাকে কেমন আনমনা লাগলো। বললেন, বলে তো ছিল। কিন্তু এখন ফের শুনছি বেচে দেবে।

বেচে দেবে? আকাশ থেকে ছিটকে যেন মাটিতে পড়লো সোমেন। কেন মা? কিনলো তবে কেন?

অস্পষ্ট হাসি হাসলেন রুমা কাকীমা। তোর তাপু মামা বদর্লি হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রকোনা। কাঁথিতে তো থাকছে না। তা...ই...

তো একটা বিশ্বস্ত লোকের হাতে ছেড়ে গেলেই পারে। দীঘার মতো জায়গায় একটা বাড়ি। ক'জনেই বা পায়? লজ কিংবা হলিডে হোম দারুণ চলবে। তুমি না করে দাও না মা?

সোমেনের আজব কথায় রুমা কাকীমা হেসে কুটিপাটি। আরে বোকা, আমি না বললে তোর মামা রাখবে? কেনার সময় কই কিছুই তো বলেনি?

তবু সোমেনের আবদার কমে না। মা, তুমি একটা চিঠি লিখে দাও না মামাকে? বেচে দেওয়ার আগে একবার ঘুরে আসি। রমেনও যাবে বলছে।

রুমা কাকীমা আমার দিকে হাসিমুখে তাকান। ভালোই তো। তোরাই না হয় যা না। চিঠি একটা লিখে আগাম জানিয়ে দে। ওরা মুম্বাই যাওয়ার আগে একটা ব্যবস্থা করে যাবে।

যেমনি চাওয়া, তেমনি পাওয়া। সোনায় সোহাগা। মা-বাবা দু'জনের কেউই যেতে রাজী হলেন না। গরমের ছুটিতে মামার নির্দেশমতো সোমেন আর আমি গিয়ে হাজির হলাম দীঘার বাড়িতে। দীঘা বাসস্ট্যান্ড থেকে মাত্র মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। সোমনের মামা ম্যাপ এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ঐ ম্যাপ ধরেই একটা বাড়ির সামনে থামলাম। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি। তবে পেল্লাই সাইজের। চারপাশে পাঁচিল। জায়গায় জায়গায় ভাঙা। নোনাধরা ইঁট ক্ষয়া দাঁতে হা-হা করছে। পুরনো একটা লোহার রেলিং দেওয়া গেট। ভেতর থেকে বন্ধ। গেটের দু'পাশে দুটো নোনাধরা থাম। তারই একটাতে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা বাড়ির নাম। সোমেনের চোখ পড়তেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, বাহ্, ভারী অদ্ভুত নাম তো—'সাগর সোনা'!

আমি বললাম, 'সাগরমানিক' রাখতে পারতো! না হয় 'স্বর্ণলঙ্কা'!

মামাকে 'দশানন' করার তালে আছিস, তাই না? সোমেনের সপাট জবাব।

কিছুক্ষণ রেলিং-এ শব্দ তুলে ডাকাডাকির পর একজন বুড়ো গোছের লোক বেরিয়ে এলো। লোকটা কুঁজো, নিচু হয়ে হাঁটে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কোথা থেকে আসছেন বাবু?

সোমেন বললো, আমি তাপসবাবুর ভাগ্নে। ঝাড়গ্রাম থেকে আসছি।

ওহ্, আপনি সোমেনবাবু আছেন তো!

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হুঁ, বাবু বলছিল। ইনি আপনার বন্ধু? বুড়ো আমার দিকে ভ্রূ তুলে একবার তাকালো।

হ্যাঁ, এ আমার বন্ধু রমেন বোস, মানে রমেনবাবু। আর তুমি রামশরণ সিং, তাই তো?

রামশরণ অদ্ভুত সংকুচিত এক হাসি হাসলো। তারপর গেটের দরজা মেলে ধরতেই আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

।। দুই ।।

আচ্ছা, মামা-মামীমা তো গত পরশু বেরিয়ে গেছে, তাই না?

হাঁ, বাবু। উনারা তো সেদিন রাতভোরেই গেল। খড়্গপুরে টিরেনে চাপবে তো? আসেন আসেন, অন্দরে আসেন।

আমরা চারদিক দু'চোখে গিলতে গিলতেই এগোলাম। স্পষ্ট বোঝা যায়, এককালে বাড়িটা ছিল ছাইরঙের। বেশ কয়েকটা জানলার গরাদ ক্ষয়ে যাওয়া কিংবা ভাঙা। সামনেই বাগান। আম, জাম, নারকেল, জামরুলের গাছ। আগাছা জঙ্গলে ভর্তি। বোঝা যায়, অনেকদিন যত্ন নেই।

আচ্ছা, এ বাড়িতে মালী নেই?

আছে বাবু। তবে ও তো ইখানে থাকে না। তাছাড়া বুড়াহাবড়া মানুষ। গতর গেইছে। তাপসবাবু বাড়ি নেওয়ার পর দু'একবার এসছিল। বাবু ডেকে পাঠালে আসে।

তা, তুমি এ বাড়িতে কতদিন কাজ করছো?

বৃদ্ধ রামশরণ কপালে ভাঁজ তোলে। হামি সেই কুড়ি বছর বয়স থেকে আছি বাবু। কলকাত্তার গাঙ্গুলিবাবু আমাকে কাজটা দিয়েছিল। ঐ বাবুরই বাড়ি। কিছু খানদানী ছিল বাবু। কলকাত্তা থেকে লোকজন আসতো। নাচ-গান-খানাপিনা হতো। সরগরম হয়ে যেতো বাড়িটা। সে সব দিন গেছে বাবু।

রামশরণের কথা শুনতে শুনতে আমরা কখন সিঁড়ির ধাপ ক'টা পেরিয়ে এসেছি বুঝতে পারিনি। বাড়িটার গঠনশৈলী ও সৌন্দর্য বিষয়ে রামশরণের কথার সত্যতা যাচাই করতে করতে দোতলার বারান্দায় হাঁটছি। পুরনো গথিক শৈলীর খিলান। নকশাকাটা বহু কিনারযুক্ত স্তম্ভ। ঢালাও বারান্দা। নির্জন ধ্যানমগ্ন বাড়িটা। দু'চারটে চামচিকে ও কালো পাখি এদিক-সেদিক উড়ে নৈঃশব্দ্য ভাঙছিল। বাগানটার জন্যে ওপাশের বাড়িঘর তেমন দেখা যায় না। পাঁচিল পেরিয়ে কয়েক গজ দূরে একটা বস্তি। জেলে-পাড়াই হবে। ছাদ থেকে দেখা যায়, জাল শুকোচ্ছে।

রামশরণ দোতলার একটা ঘর খুলে দিল। প্যানেল-করা সেগুন কাঠের দরজা। মিহি কারুকাজ দেখে অবাক হতে হয়। মোজাইক-করা মেঝে। যত্রতত্র তেলচিটে কালো দাগ। অনেকদিন ব্যবহারই হয়নি। ব্যাগপত্র ঝোলাঝুলি রেখে আমরা হাঁফ ছাড়লাম।

পেল্লাই মাপের একখানা পালঙ্ক। ঢাউস বিছানা। পাশেই পাতা সোফা-কাম-বেড। সোমেন ওটাতেই বসে গা এলিয়ে দিল। পুবের কোনায় জানলার ধারে একটি টেবিল পাতা। তাতে মামার কয়েকটা বইপত্র। দু'পাশে দুটো বেতের চেয়ার। খানিক ভাঙাচোরা। ওগুলো সবই বাড়ির আদি মালিকের। রামশরণের কথায় জানা গেল, তাপু মামা নাকি বেডশিট কভার সবই নতুন লাগিয়েছে। ভেতরটাও নতুন করে হোয়াইট ওয়াশ করিয়েছে। জামা-প্যান্ট ছেড়ে চোখমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে বসেছি, দরজার দিকে তাকাতেই দেখি, রামশরণ মিটিমিটি হাসছে, বাবু—চা?

আমি তো একরকম চমকেই গেলাম। ধন্যবাদ দিতে হয় এই হিন্দুস্থানী বুড়োটাকে। মনটাও চা-চা করছিল।

সোমেন জিগ্যেস করলো, কতদূর চায়ের দোকান?

ঐ তো বাবু। রাস্তার মোড়েই।

যাও পয়সাটা দিয়ে এসো গে। বলে আমি ওর হাতে দু'টাকার একটা নোট গুঁজে দিই।

ও নির্লিপ্তের ঢঙে বলে, পয়সা দিয়েছি বাবু।

সোমেন বলে, অ্যাই দেখ, তুমি কেন দেবে?

রামশরণ একটু হেসে বলে, কেন,

গরীব বলে কি এটুকু করতে পারি না? আপনারা এসেছেন! তাছাড়া ক'টাই বা পয়সা?

আমি কিছু বললাম না।

প্রসঙ্গ পাল্টালো রামশরণ, বাবু, দুপুরের রান্না?

না-না-না। ও আমরা হোটেলেই খেয়ে নেবো। অযথা তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? তাপুমামাকে সেকথা আমরা লিখে জানিয়েছি।

ঘাড় কাত করে শুনছিল রামশরণ। বললো, না বাবু। কষ্ট কি? কত খুশি করে আসছেন। হোটেলের ঝালঝোল খাবেন? বাবু শুনলে বকবে না?

না হে না, বাবু তোমাকে কিছু বলবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

তবু রামশরণ কি শোনে! শেষে অনেক করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে থামানো গেল। রামশরণ আমাদের জন্য দোতলার বারান্দার কোণে একটা কুঁজোতে জল এনে রাখলো। তারপর ঘরের চাবির গোছা আমাদের ধরিয়ে দিয়ে বললো, সিঁড়ির নিচের ঘরটাতে আছি। দরকার হলেই ডাকবেন কেমন।

আমাদের পাশের ঘরটি সেই বিখ্যাত নাচঘর। রামশরণের কথা শুনে অবধি ওটি দেখার জন্যে আমরা ছটফট করছি। তাই ওকে পিছন ফিরতে দেখে সোমেন বলে বসলো, আচ্ছা, ঐ ঘরের চাবিটাও কি এর সঙ্গে আছে?

উঠে এলো রামশরণ। হ্যাঁ। ওঃ! বাবুদের তো ঐ ঘরটা দেখানো হয়নি। বলেই আমার হাত থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে খুলে দিল ঘরটা।

বিরাট হলঘর। জানলাগুলোর শার্সি দিয়ে ঘোলাটে আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। কেমন এক গা-ছমছমে পরিবেশ। দরজা-জানলা সব বন্ধ থাকায় ঘরে গুমোট গন্ধ।

সোমেন বললো, তাপুমামা এ ঘরটা ব্যবহার করে না?

ধীরে মাথা নাড়লো রামশরণ। না বাবু। আপনাদের তখন বলছিলাম না এটাই সেই নাচঘর—বুঝলেন?

আমি যাত্রা-থিয়েটার বা সিনেমায় নাচগানের আসর ঢের দেখেছি। কিন্তু জমিদার, রাজারাজড়ার বা কলকাতার বাবুদের গানের জলসা দেখিনি। মনে মনে তার একটা ছবি এঁকে নিলাম।

দুপুরে হোটেলে খেয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম। বিকেলে গেলাম সমুদ্রের ধারে। ঝাউবনের হাওয়ায় দোল খেতে খেতে সমুদ্রের ঘোলা জলে নেমে হাঁটা। কী ভালোই না লাগলো! সোমেন বললো, গতবছর আমরা পুরী গিয়েছিলাম। ওখানে অনেকটাই বালিয়াড়ি। আর বড় বড় ঢেউ। জলটাও খুব নীল। কিন্তু এখানে দেখ জলটা কেমন একটু ঘোলাটে। বালিয়াড়ি নেই বললেই চলে। তবে অনেকটা ভেতরে হেঁটে যাওয়া যায়।

মানে 'মহীসোপান' অনেকটা চওড়া, আর 'মহীঢাল' অনেকটা দূরে—তাই তো?

সোমেন চোখ কুঁচকে ভঙ্গি করে। বাহঃ! এক্কেবারে ভৌগোলিক বিশ্লেষণ!

পরদিন আবার সাগরস্নান। ঝিনুক বিশেষ পাওয়া যায় না। তবুও খোঁজার চেষ্টা। একটা জায়গায় জল শুকিয়ে কাদা-ডোবা। অদ্ভুতদর্শন মোটামাথা মাছ একটা মরে পড়ে আছে। হৈ হৈ করে ল্যাজ ধরে বীরদর্পে সোমেনের দিকে নিয়ে আসছি। দেখ দেখ একটা সামুদ্রিক মাছ পেয়ে গেলাম।

সোমেনের চোখেমুখে খুশির আলো। জ্যান্ত না কি রে? স্থানীয় এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁকে সোমেন জিগ্যেস করলো, কাকু, এই মাছটার নাম কি?

ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। তারপর হাসতে হাসতে যা বললেন, তাতে ভীষণ বোকা বনে গেলাম। ওটা মাছ নয়, সামুদ্রিক ব্যাঙ।

একটা জায়গায় শঙ্কর মাছ দেখলাম। কী ভয়ঙ্কর তার কাঁটাওলা ল্যাজ। ধরা পড়েছে কত সামুদ্রিক কচ্ছপ ও জ্যান্ত শাঁখ। স্তূপীকৃত সামুদ্রিক নানাবিধ মাছ।

এবার পুজোয় প্রকাশিত হবে
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নতুন গল্প,
গোয়েন্দা গল্প, ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার,
ভ্রমণ, হাসির গল্প, কল্পবিজ্ঞান, কবিতা,
কার্টুন, ছড়া, নানা স্বাদের ফিচার ও
কমিকস্-এর সংকলন

এতে লিখেছেন ঃ
- অন্নদাশঙ্কর রায়
- অদ্রীশ বর্ধন
- অনীশ দেব
- চণ্ডী লাহিড়ী
- চিত্তরঞ্জন মাইতি
- দুলেন্দ্র ভৌমিক
- নারায়ণ সান্যাল
- নিরঞ্জন সিংহ
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- প্রফুল্ল রায়
- শক্তিপদ রাজগুরু
- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- শৈলেন ঘোষ
- ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- সুনির্মল বসু
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- হিমানীশ গোস্বামী

ও আরও অনেকে

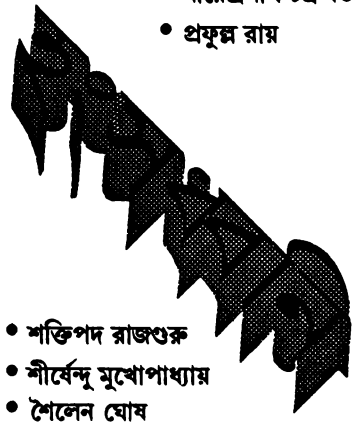

শারদপত্রে থাকছে বিশিষ্ট তথ্যবহুল একটি ফিচার—পৃথিবীর বিভিন্ন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কাহিনী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
২৪১ ২২৪৩

সারাঘর খাঁ খাঁ করছে।

তাদের আঁশটে গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার যোগাড়। এই মাছ চলে যাচ্ছে দূরদূরান্তে। বিক্রি হচ্ছে হাটে-বাজারে ধুমধাম করে। শিয়ালদা মার্কেটেও এই শুঁটকি মাছের রমরমা দেখেছি।

॥ তিন ॥

ঘটনাটা ঘটলো ঐ দিন রাতে।

রাত প্রায় দুটো-আড়াইটা হবে। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। এ কী! এই রাত-দুপুরে ঘুঙুর পায়ে কে নাচছে? নাকি স্বপ্ন দেখছি? চোখ কচলে ক্ষনিকক্ষণ থম মেরে বিছানায় জেগে রইলাম। না। স্পষ্ট ঝমঝম শব্দ। একবার বাড়ে, তো আবার কমে। ঝমঝম...ঝমঝম...ঝমঝম...। কান ঝালাপালার যোগাড়। মনে হলো, দরজার বাইরেই কেউ নাচছে। আশ্চর্য! ফিরে দেখি, সোমেন তখনও নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঠেলা দিয়ে ওকে তুললাম।

একরকম আঁতকে ধড়মড় করে উঠে বসলো ও। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে পরক্ষণেই হাঁ করে থাকলো। বাইরের বারান্দায় তখন নাচের ঝড়। চল তো দেখি ব্যাপারটা কি? হতভম্ব সোমেন চোখ বড় বড় করে বললো।

আমি ওকে আটকালাম, তোর মাথা খারাপ?

আরে, নিশ্চয়ই কেউ নাচছে। তা না হলে শব্দটা আসছে কোত্থেকে!

তুই কি ভূতটুতের কথা ভাবছিস নাকি?

সোমেনের আলটপকা কথায় আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কারণ আমার মনে তখন রামশরণের সেই গান-বাজনার কথা ভাসছিল। আলতো মাথা নাড়লাম, না-না, তা ভাবছি না, কি-ন-তু...এটা যে স্পষ্ট ঘুঙুরেরই শব্দ।

সোমেন বললো, তা হতেই পারে। নতুন আগন্তুক দেখে কেউ ভয়ও তো দেখাতে পারে।

আমার বুকটা টিপটিপ করছে। নাচঘরের চাবিটা যে আমারই কাছে। তবু সোমেনের কথায় সাহস করে আলো জ্বালালাম। দরজা খুলে বারান্দায় এলাম। অবাক কাণ্ড! তখনো ঐ নাচঘরে ঝমঝম শব্দের তুফান বয়ে যাচ্ছে। চাবি দিয়ে ঘরটা খুলে ঢুকলাম। না কোত্থাও কিচ্ছু নেই। সারাঘর খাঁ খাঁ করছে। নিজেদের খুব বোকা মনে হলো। ঘরে ফিরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার কিছু হলে রামশরণকে ডাকবো। আচ্ছা লোক বটে, নাচঘরের কথা বললো অথচ এরকম কাণ্ড যে ঘটে তা তো বলেনি! সেটা কি আমরা ভয় পাবো বলে? সাতপাঁচ ভাবতে লাগলাম। দু'চোখের পাতা আর এক হলো না।

আধঘণ্টা খানেক পরে আবার সেই ঝমঝম শব্দ। এবারে মনে হলো, কোনো মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে যাচ্ছে।

ছিটকিনি খুলে বারান্দায় এলাম। নিঃশব্দে এগোচ্ছি। সেই রহস্যময় পায়েলের আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। হঠাৎ নৈঃশব্দ্যের বুক চিরে জেগে উঠলো সোমেনের বিদ্যুৎ-বজ্র কণ্ঠ—রামশরণ! রাম...শরণ! ও রাম... শিউরে উঠলাম ভেতরে ভেতরে। আবার কিছু না একটা ঘটে যায়!

কী আশ্চর্য! মুহূর্তেই ঘুঙুরের শব্দ থেমে গেল। একেবারে শুনশান। টর্চের প্রখর আলোয় দু'একটা বাদুড় মাথা ছুঁয়ে চিক চিক করে উড়ে গেল। আর বুড়ো রামশরণ হেঁড়ে গলায় গর্জে উঠলো, কৌন

হ্যায় ? প্রতিধ্বনিমুখর সেই অদ্ভুতুড়ে প্রাসাদ বলে উঠলো, কৌন হ্যায় ? কৌন হ্যায়...কৌন হ্যায় ?

আমরা সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলে রেখেছি। টালমাটাল পায়ে উপরে উঠে আসছে বৃদ্ধ রামশরণ।

কি হয়েছে বাবুজি ? ঘুঙুরের আওয়াজ শুনেছেন বুঝি ?

আমরা নির্বাক। আশ্চর্য ! রামশরণ যেন নির্বিকার।

সিঁড়ি বেয়ে একটু আগে কে যেন নেমে গেল ?

রামশরণের ভ্রূ-যুগল কপালে উঠলো। মুখটা কাঁচুমাচু করে ও বললো, আপনারা লিখাপড়া জানা ছেলে। তাই ওসব আর বলিনি। মাঝে মাঝে এরকমই হয়। তাপুবাবুও প্রথম প্রথম ঘাবড়ে যেতো। ও কুছু না। মানে ঘরটাতে নাচটাচ খানাপিনা হতো তো...। তা ভয় পেলেন নাকি ? ভয় পাবেন না। যান যান, শুয়ে পড়ুন গে। রাত তো বেশি নাই। রামশরণ নিচে ফিরে গেল।

আমরা যথারীতি ঘরে ঢুকে আবার শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙলো, জানলার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকেছে। আরে, রামশরণ কি তবে চা নিয়ে ফিরে গেল ? সোমেনও উঠলো। হাতের চেটো উল্টে চোখ কচলাতে কচলাতে বললো, না ভাই, আর মামাবাড়িতে কাজ নেই। চল, সকালের বাসেই কেটে পড়ি।

আমি বললাম, আর বলিস না। রামশরণ না থাকলে কাল কী অবস্থা যে হতো !

সোমেন থম মেরে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বেশ চিন্তান্বিতভাবে মাথা নাড়লো, মা এইজন্যই প্রথমে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি—বুঝলি ?

হুঁ, তাই তো। বোধহয় রুমা কাকীমা জানতেন ব্যাপারটা। তাই বললেন, পুরনো বাড়ি। তোর মামাও বড় একটা থাকে না। কিন্তু এই ভুতুড়ে কাণ্ড বোধহয় শোনেননি। নাকি আমরা ভয় পাবো বলে....

সোমেনের মুখ রাগে, অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছিল। মা-ই এমন করলো !

আমি বললাম, দেখ, রাগ করে তো কিছু হবে না। বাড়ি গেলেই ব্যাপারটা জানা যাবে। রুমা কাকীমা বাড়িটা বিক্রির কথা বলছিলেন না—মনে আছে ?

আড়মোড়া ভাঙলো সোমেন। ধ্যুত্তেরি মাঝখান থেকে ঘুমটাই ভালো হলো না !

চল, বাড়ি গিয়ে ঘুমুবি। বলেই আমি উঠে ছিটকিনি খুলে বারান্দায় এলাম। নিচে রামশরণকে দেখতে পাবো ভেবে একবার উঁকিঝুঁকি দিলাম। কিন্তু কই, তাকে তো দেখছি না। তবে কি এখনো ওঠেনি ! দু'তিনবার হাঁকডাক দিয়েও কোনো সাড়া না পেয়ে দু'জনেই সিঁড়ি বেয়ে নামছি। সঙ্গে লটবহর। রাতটা তো প্রায় জেগেই কাটলো। এখন বোধহয় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকাটা উচিত হবে কি ? কিন্তু চাবিটা দিয়ে যেতে হবে যে।

রামশরণ...ও শরণজী...আরে কিতনা নিঁদ যাতা হ্যায় ! ভুলভাল হিন্দী বলেও ওর ঘুম যখন ভাঙলো না, তখন আমরা সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেলাম। কাল যা ঘটেছে। ওরে বাপ্স ! ভেতর থেকে ওর দরজাটা বন্ধ। কিছুতেই যখন উঠলো না, তখন দরজায় দুমদাম লাথি। একসময় পাল্লা দুটো খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট গন্ধ ধাঁ করে ছুটে এল বাইরে। ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার যোগাড়।

রামশরণ কম্বল গায়ে তক্তপোশের নিচে পড়ে আছে। মুখে গ্যাঁজলা। তাড়ির উটকো গন্ধ। চোখ দুটো উল্টানো। মুখটাও হাঁ করা। যেন কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু বলার সময় পায়নি। কম্বলটা সরিয়ে দেখা গেল, হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা। সোমেন নাড়ি টিপে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, ইস্ বুড়োটাকে আমিই মেরে ফেললাম রে। আমার জন্যেই মরলো...উফ্ আমার জন্যেই...

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম। ধ্যুত্তেরি। তুই মারলি কী করে ?

কাল সন্ধ্যায় ও বকশিশ চাইছিল। পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। আর তাতেই তো—সোমেন মাথা চাপড়াতে লাগলো।

আর আমার তো মাথা খারাপের যোগাড়। শেষরাতের দিকে তবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো কে ? তবে কি...

ছবিঃ সৈকত শোভন পাল

বিচিত্র খবর বরুণ মজুমদার

সর্বকনিষ্ঠ মাস্টার ডিগ্রিধারী

বারো বছরের কমবয়েসী একটা ছেলে এম. এসসি পাশ করেছে শুনলে অনেকে অবাক হবেন তাই না ? বিহারের তথাগত অবতার তুলসী এক্ষেত্রে সত্যিই এক ব্যতিক্রম। তুলসি কিন্তু তার বয়েসী আর পাঁচটা প্রতিবেশী ছেলের মতোই। কিন্তু তার মেধা অসাধারণ। সে মাত্র ১১ বছর ১০ মাস বয়েসে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম. এসসি পাশ করে বিশ্বরেকর্ড করেছে সবচেয়ে কম বয়েসে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করার ক্ষেত্রে। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এবার তার নাম উঠছে। তথাগত সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় মাত্র সাড়ে ৯ বছর বয়সে পাশ করেছে এবং সায়েন্স কলেজ থেকে সে সাড়ে দশ বছর বয়েসে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হয়েছে। তথাগতের পিতা বিহারের একটি কলেজের লেকচারার। তথাগত শুধু পিতা-মাতার গর্ব নয়, বা বিহারের গর্ব নয়, সারা ভারতের গর্ব।

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

ওরাও কথা বলে

গত মাঘ সংখ্যায় শুকতারায় শৈলেন দত্তর 'ওরাও কথা বলে' লেখাটি আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। এখন দেখছি লেখাটা ইউরি দমিত্রেভ-এর 'ওরাও কথা বলে' বই থেকে নেওয়া। মস্কোর রাদুগা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বইটির ১১ পাতা থেকে পড়লে পাঠকগণ নিঃসন্দেহ হবেন।

মহঃ মামুন হাসান।

(প্রযত্নে—ইয়ান আলি, পোঃ গোলাপবাগ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ)

আরো গোয়েন্দা গল্প চাই

আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আমি চাই শুকতারায় আরো গোয়েন্দা গল্প ছাপা হোক। সুদর্শন নন্দীর 'ভজহরির চিকিৎসা' গল্পটা খুব ভাল লেগেছে।

উদিৎ বিশ্বাস

(প্রযত্নে—বিশ্বনাথ বিশ্বাস, মনসাতলা, গুপ্তিপাড়া, হুগলি)

তুমি সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই অংশ নিতে পারো। ও তো তোমাদের জন্যই।

খুব ভাল লাগে

শুকতারা আমার খুব ভাল লাগে। এর প্রত্যেকটি বিভাগই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনের জানলা, কেরিয়ার গাইড, যোগ ও ব্যায়াম তো এককথায় অনবদ্য। আষাঢ় মাসের ভৌতিক সংখ্যাটি খুব ভাল লেগেছে।

অসীম মণ্ডল।

(প্রযত্নে—হরিপদ মণ্ডল, পোঃ সাপটগ্রাম, জেলা ধুবড়ি, অসম—৭৮৩ ৩৩৭)

দাদুও শুকতারা পড়েন

আমার দাদু এখনো শুকতারা পড়েন। আমরাও পড়ছি। শুকতারা আমাদের জেনারেশনের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে। আমার আবেদন শুকতারায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভাগ দিন।

প্রিয়াঙ্কা বল

(প্রযত্নে—দেবাশিস বল, পোঃ—চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান—৭১৩ ৩৩১)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

নিভাননীরা আজ উপেক্ষিতা

আজকের এই নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির যুগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সব জায়গায় বড় বেশি উপেক্ষিত হয়ে পড়ছেন। আধুনিক সভ্যতার ইঁদুর দৌড়ে পাল্লা দিতে গিয়ে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ওল্ড মডেলের আসবাবপত্রের মতোই পরিত্যাগ করছে। উচ্চবিত্ত পুত্রের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই।

এই প্রসঙ্গে আমার পরিচিত এক মহিলার কথা বলি। তাঁর নাম নিভাননী—নিভাননী রায়। অল্পবয়সে স্বামীকে হারানোর পর তিনি তাঁর ছেলেদের মানুষ করেছিলেন অমানুষিক পরিশ্রম করে। এখন তাঁর বয়েস সত্তরের ওপর। বড়, মেজ, ছোটর বাড়িতে পালা করে অস্থায়ী বসবাস। কারো কাছেই তিনি আজ আদরণীয়া তো ননই, গ্রহণযোগ্যাও নন। অথচ একটা সময় ছিল যখন ওঁকে ছাড়া এই সংসারটা ছিল অচল। সংসারের সব কিছুই ছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো আজকের উচ্চবিত্ত ঐ তিনটি ছেলে। আজ ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেছে, বউ এসেছে। তাঁর আর দরকার নেই। সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই তিনি উপেক্ষিত, অবহেলিত। বৌমাদের বিদেশী জিনিসে সাজানো রান্নাঘরে ঢুকতে তাঁর ভয় করে, শ্বেতপাথরে মোড়া ঠাকুরঘরে ব্রোঞ্জের মূর্তিতে তিনি প্রাণ পান না। নাতিকে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শোনাতেও বৌমাদের কড়া আপত্তি। ও সব শুনলে নাকি ছোটদের 'টেস্ট' নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেদের কেতাদুরস্ত বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে অজস্র বলিরেখায় ভরা মুখ আর সাদা থান পরা মাকে বার করা যায় না। তাতে নাকি সামাজিক স্ট্যাটাস নষ্ট হয়। তাহলে আজ নিভাননীদেবীদের জায়গা কোথায়? কাশীবাসী আজ আর হওয়া যায় না সহজে। তাই ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিদের থেকে বহুদূরে কোনো এক ওল্ড এজ হোমে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গোনা ছাড়া সত্যি কি আর কোনো উপায় নেই নিভাননীদেবীদের ভাগ্যে?

ঝিমকি বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রযত্নে—পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২২ কলেজ রোড, সাঁইথিয়া, বীরভূম—৭৩১ ২৩৪)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তারজন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম).....

সম্পূর্ণ ঠিকানা .....

নীলপুরের মিলুমামা

মনোতোষ মিশ্র

মিলুমামার ম্যালেরিয়া হয়েছে। টেলিফোনে খবরটা পেয়ে মা মনমরা। মালতী গাছের মাথার উপরে খোলা আকাশের দিকে মায়ের বিষণ্ন চোখ। ছলছল।

ম্যালেরিয়া এখন প্রায় মহামারী। হাসিখুশি মিলুমামা ভাইফোঁটার দিনও পাড়া মাতিয়ে গেছেন। নীলপুর হাইস্কুলে ভূগোল পড়ান। সেই মিলুমামার ম্যালেরিয়া। ভাইফোঁটার দিন সে কী কাণ্ড! আমি, আকাশ, বিয়াস সবাই আমার পড়ার ঘরে ছুটির আনন্দে মশগুল। মিলুমামা দুম করে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেন, কি রে পিন্টু, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

খুব ভাল নয়, মোটামুটি হচ্ছে মামাবাবু।

এই যে তোরা মোটামুটি বলিস আমার খুব খারাপ লাগে। হয় বলবি ভাল, না হয় খারাপ। না অথবা হ্যাঁ। মাঝে কোনো প্ল্যাটফর্ম থাকবে না। আসলে তোদের আত্মবিশ্বাস নেই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। যাকগে, তোরা কেউ বলতে পারবি—

আমি, আকাশ, বিয়াস একসঙ্গে তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠি, মামাবাবু, আজ কোনো প্রশ্ন নয়। বরং মজার গল্প-টল্প কিছু বলুন।

মজার গল্প! আচ্ছা ঠিক আছে। একটা মজার বিষয় জিজ্ঞেস করি?

তাই করুন।

প্রশ্নটা ভাল করে শুনবি তারপর উত্তর দিবি। আমি তোদের তিনটি বাংলা বানান জিজ্ঞেস করব, পারবি তো?

চেষ্টা করব!

বানান কর, রাম।

র এ আকার ম।

রহিম?

র-হ-এ হ্রস্ব ই-কার ম।

হয়নি?

তিনজনে চিৎকার করে উঠি, হয়নি মানে? আমরা ঠিক বলেছি।

মিলুমামা একটু হেসে বলেন, 'হয়নি' বানানটা কর। আমি তোদের তিনটি বানান জিজ্ঞেস করেছি।

আমরা তো হেসে কুটি কুটি। বিয়াস বলে, মামাবাবু আর একটা কিছু হোক।

আবার চাই? এবার তাহলে একটু খটমট প্রশ্ন করি?

হোক না! আমরা চেষ্টা করব।

উনত্রিশটা লেটার আছে এমন একটা ইংরেজি শব্দ বল তো?

ওরে বাব্বা! এ যে অসম্ভব! আমাদের সাধ্যি নেই।

চেষ্টা কর।

কিছুতেই পারব না মামাবাবু।

শব্দটি হলো—FLOCCINAU-CINIHILIPILIFICATION. মানে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণনের অভ্যাস বা স্বভাব।

বাপরে সত্যিই খটমট! দাঁত ভেঙে যাওয়ার যোগাড়। এসব চলবে না মামাবাবু। এবার একটা ভূতের গল্প বলুন।

ভূত! তোরা ভূত বিশ্বাস করিস? মনের ভুল, বুঝলি সব মনের ভুল। ভূত বলে কিস্সু নেই।

তবুও একটা বানিয়ে-টানিয়ে কিছু বলুন।

দেখ, ঐসব ভূত-টুতের আজগুবি গল্প আমি জানি না। ওসব গল্প বানাতে গেলে আমাকে নিজেই ভূত হতে হয়। যাঃ চলে! এই সময়ই লোডশেডিং হয়ে গেল।

মামাবাবু, লোডশেডিং-এ ভূতের গল্প জমবে ভালো!

লোডশেডিং হলে তোদের খুব মজা হয়, তাই না রে। বেশ পড়তে-টড়তে হয় না। কিন্তু তোরা জানিস কি দু'হাজার পঁচিশ সালে হাইড্রোজেন গ্যাস এক চমক সৃষ্টি করবে?

কি রকম? কি রকম?

শোন। পেট্রোল, কেরোসিন, কয়লা একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন গ্যাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। হাইড্রোজেনের সত্তর হাজার কোটি পরমাণুকে ছ'কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করলে তৈরি হবে হিলিয়াম পরমাণু, বেরিয়ে আসবে বিদ্যুৎশক্তি। দূর হবে লোডশেডিং।

এইসব নানান গালগল্প, হাসি আর মজার তুফান তুলে পিন্টুর পড়ার ঘর থেকে সারা পাড়া জমজমাট করে ভাইফোঁটা নিয়ে পরের দিন মিলুমামা চলে যান নীলপুরে। সেই মিলুমামার ম্যালেরিয়া।

পিন্টু মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, মা, কাল একবার মামাবাবুকে দেখে আসি?

মা মালতী গাছ থেকে চোখ সরিয়ে বলেন, তুই পারবি যেতে?

খুব পারব।

পরের দিন দুপুরে পিন্টু বেরিয়ে পড়ে। নীলপুরের বাসে খুব ভিড়। সারাদিনে মাত্র দুটো বাস। কোনোরকমে সে বাসে ওঠে। পাহাড়ী রাস্তায় ধীরগতিতে এগোতে এগোতে বাস যখন নীলপুরে পৌঁছায় তখন প্রায় সন্ধ্যে ছটা। অন্ধকার হয়ে আসছে। গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী— সবকিছু আবছা দেখাচ্ছে। এখান থেকে প্রায় আধঘণ্টার হাঁটাপথ। তিন রাস্তার মোড়ে নাম-না-জানা একটা পাখি ট্যা-ট্যা-ট্যা করে ডেকে ওঠে। বাসস্ট্যান্ড থেকে দূরে ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে টিম-টিম করে আলো জ্বলছে। পিন্টু দোকানের কাছে গিয়ে একটু বসে কি করবে চিন্তা করে। হঠাৎ দেখে হাসিখুশি মিলুমামা দোকানের দিকে এগিয়ে আসছেন। মামাকে দেখে পিন্টু খুব খুশি। তার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়।

মিলুমামা জিজ্ঞেস করেন, কি? বাস লেট করেছে তো?

হ্যাঁ, প্রায় দু'ঘণ্টা। পিন্টু উত্তর দেয়।

এ তো রোজকার ঘটনা। রাস্তার যা অবস্থা, এর থেকে তাড়াতাড়ি আসা যায় না। ভাইফোঁটার পরের দিন তোদের ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত ন'টা বেজে গিয়েছিল। যাক, তোর কোনো চিন্তা নেই। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম আমার ম্যালেরিয়ার খবর পেয়ে তোরা কেউ আসবি। ভাগ্যিস লাস্ট বাসটা দেখতে এলাম।

মামাবাবু, আপনি না এলে সত্যিই আমার খুব অসুবিধে হতো! আপনি এখন কেমন আছেন? মা আপনার জন্য খুব চিন্তা করছেন। জ্বর কমেছে তো?

জ্বর! এই শরীরে আবার জ্বর!

ম্যালেরিয়ায় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে আর যায়। আপনার খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়?

না, সেরকম কষ্ট হয়নি। তাছাড়া—

সেই অচেনা পাখিটা আবার ট্যা-ট্যা-ট্যা করে ডেকে ওঠে।

মামাবাবু, ওটা কি পাখি?

নিশাচর কোনো পাখি বোধহয়! তোর ভয় করছে বুঝি? আরে আমি আছি, ভয় কি! ভয় পাবি না একদম। ভয় মানেই মনের ভুল।

পিন্টুর যে ভয় করছে না তা নয়। কেমন যেন একটা গা ছম-ছম ভাব। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে চামড়া ছাড়ানো শুয়োরের মতো গোলগাল একটা জন্তু তার পিছনে গড়াতে গড়াতে আসছে। পিন্টু একটু থামে। জন্তুটাও থামে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে সে, মামাবাবু, পিছনে ওটা কি?

কই? কোথায়? তোর পিছনে কিছু দেখছি না তো! বোকারাম। সব তোর মনের ভুল। আমার হাত ধর।

মামাবাবু, আপনার হাতটা কী ঠাণ্ডা!

হ্যাঁ, শরীরে আর গরম নেই! তার উপর শীত শীত করছে। ঐ দেখ আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে! ঐ বোধহয় তোর মামীমা আলো হাতে দাঁড়িয়ে। আমি একটু গোপালের দোকান থেকে ঘুরে আসছি। তুই এবার পারবি তো যেতে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারবো। আপনি তাড়াতাড়ি ফিরবেন।

আচ্ছা, বলে মিলুমামা মিলিয়ে যান অন্ধকারে।

পিন্টু এগিয়ে যায়। রাধামন্দিরে রবিমামুর সঙ্গে দেখা। রবিমামু পিন্টুকে জিজ্ঞেস করেন, খবরটা বুঝি দেরিতে পেয়েছিস?

কিসের খবর? অবাক পিন্টু পাল্টা প্রশ্ন করে।

তোর মিলুমামার মতো ভূগোলের মাস্টার আর হয় না রে পিন্টু। মাত্র তিনদিনের ম্যালেরিয়ায় সেই মিলু আমাদের সবাইকে ছেড়ে...

সে-কি! তাহলে মামাবাবু যে আমাকে এতটা পথ...

অচেনা পাখিটা ফের ট্যা-ট্যা-ট্যা করে ডেকে ওঠে। পিন্টু বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে একবুক কান্না আর বিস্ময় নিয়ে।

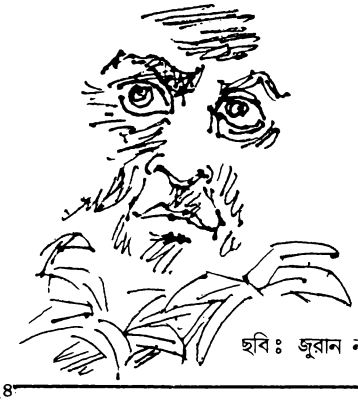

ছবিঃ জুরান নাথ

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

মাঝে একদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। ওখানে গেলেই মন ভালো হয়ে যায়। সব ঘুরে ঘুরে দেখে ঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর ফিরে আসি। বেলুড়ে গেলে আগে তো ঠাকুর প্রণাম তারপর অন্যকিছু। সেদিন জুতো খুলে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিয়েছি কী দিইনি চমকে উঠলাম একদল কচি-কাঁচার কলকণ্ঠে। ওদের সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি বারবার বলছেন, চুপ করো চুপ করো, এখানে হৈচৈ করতে নেই। কেউ গাছে হাত দিও না। ফুল ছিঁড়বে না...!

কে কার কথা শোনে। হৈচৈ তো ওরা থামালোই না উল্টে গাছের পাতা-টাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলল।

আমার বড় কষ্ট হলো। জানি শুকতারার বন্ধুরা ঐরকম কাজ করতেই পারে না। কিন্তু ওরাই বা কেন করবে? ওরাও তো আমাদেরই ঘরের ছেলে-মেয়ে।

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি। সেদিনও আমি মন্দিরের দিকে এগোচ্ছি। দেখলাম, একদল স্কুলের ছেলে-মেয়ে লাইন দিয়ে মন্দিরের সামনে এসে এক এক করে জুতো খুলে মন্দিরের মধ্যে যাচ্ছে। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। হাতজোড় করে ওরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। সবার পেছনে ছিলেন একজন সিস্টার। তাঁর গলায় 'ক্রশ' ঝুলছে। তিনিও জুতো খুলে হাতজোড় করে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। একটু পরে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে এসে গোটা বেলুড় মঠ ঘুরে ঘুরে দেখালেন। আমার এত ভালো লেগেছিল ছেলে-মেয়েদের আচরণ, তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণ মনোভাব যে ওরা যখন চলে যাচ্ছে তখন সিস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

সিস্টার কলকাতার একটি মিশনারি স্কুলের নাম বলেছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কেউ কথা বলল না, হাতজোড় করে মন্দিরে গেল, প্রণাম করে এল কাউকে বিরক্ত না করে এ শিক্ষা....

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সিস্টার বললেন, কেন আমরাই দিই। ওরা একইভাবে চার্চেও যায়। এইটাই তো শিক্ষা!

ঠিকই তো! শুধু পড়া মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দেওয়াটা কোনো শিক্ষাই নয়। মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠাই তো আসল শিক্ষা। এইরে, চুপ করে যাই। তোমরা নির্ঘাৎ ভাবতে শুরু করেছো, দাদুমণির হলোটা কী। জ্ঞান দিচ্ছে যে! জ্ঞান নয়, যা সত্যি, যা দেখেছি তাই শুধু তোমাদের বললাম। কেন বললাম তা তোমরাই ভেবে নাও।

থাক ওসব কথা, পুজোয় কেমন মজা করলে বলো। কে ক'টা ঠাকুর দেখেছো, কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি? সব জানিও কিন্তু। আর পুজো সংখ্যাগুলো পড়া হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

শুকতারা শুকতারার মতোই তাই না? এবারের শারদীয় শুকতারা তোমাদের কেমন লাগলো তা জানাতে ভুলো না। সামনেই কালীপুজো, ভাই-ফোঁটা—তাই নিয়ে তোমরা এখন ব্যস্ত। তুবড়ি-টুবড়ি বানাতে হবে তো?

ওদিকে দিনের চেয়ে রাত এখন বড় হতে আরম্ভ করেছে। ভোরের দিকে শীত শীত ভাব। কাঁথা-টাথা গায় দিতে ইচ্ছে করে। শেষ শরতে শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তবে শিউলি ফুল এখনো ফুটছে। স্থলপদ্ম, জবাও গাছ ভরে আছে। আকাশ এখনো ঘন নীল। রোদ সোনালী। প্রকৃতি এখনো ধরে রেখেছে পুজোর আমেজ। আকাশেও লেগেছে দীপাবলীর ছটা। চাঁদের আলো যেন তরল সোনা। তারারা উজ্জ্বল। ছায়াপথ স্পষ্ট। পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নেমে গেছে। হারিয়ে যাচ্ছে বৃশ্চিক রাশি। পুব আকাশে দেখা দিয়েছে বৃষ রাশি। বৃষ রাশির কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকেই এ মাসের নাম কার্ত্তিক। এ তো তোমাদের জানা।

এসো এবার তোমাদের কয়েকজনের চিঠির উত্তর দিই।

শেখ মহঃ আব্দুল্লাহ (প্রযত্নে—শেখ সুলতান আহমেদ, গ্রাম সতীতলা, পোঃ আরামবাগ, জেলা হুগলি-৭১২ ৬০১)

উত্তর ঃ কোনো ব্যাপারে কখনো আশা ছাড়বে না। তুমি একটা কাজ করো। পড়ার বই ছাড়াও একটু বেশি করে গল্পের বই, মনীষীদের জীবনী পড়ো। দেখবে ভালো লাগবে। মনে রেখো, বই-এর চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। শুকতারার বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই চিঠি দেবে।

রঞ্জন দাশ (প্রযত্নে—পি সি দাশ, ২/ই, রেলওয়ে কলোনি, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৩৫)

উত্তর ঃ তোমরা সকলেই শুকতারার বন্ধু। শুকতারার বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই চিঠি দেবে। তুমিও দাও না।

মহুয়া ও শর্মিষ্ঠা গুহরায় (প্রযত্নে—বিনয় রঞ্জন গুহরায়, ৩, দীনুবাবুর লেন, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ১০৯)

উত্তর ঃ এবার খুশি তো? দেখো শুকতারার বন্ধুরা তোমাদের চিঠি দেবে। তোমরাও দাও না।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

সৌমেন্দু পাল, বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী,
সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতন
শেওড়াফুলি, হুগলী

শচীন তেন্ডুলকার

নামছে মাঠে সে
কে? কে? কে?
বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার,
নাম তার শচীন তেন্ডুলকার।

M R F ব্যাট হাতে,
পায়ে প্যাড গ্লাভস সাথে।
কিছুক্ষণ পরে বোলার,
বল করল বাউন্সার।

সবাই আছে চোখ বুজি,
ভাবছে সবাই এই বুঝি
উইকেট ভেঙে যায়।
চোখ খুলে দেখে তারা!
বল গেছে ছক্কায়॥

সৈকত ব্যানার্জী,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন

ভ্রমণ বিভ্রাট

পিকনিকেতে যাওয়া হবে
কিন্তু কোথায় কবে?
সেটাই এখন সবাই বসে
ঠিক করতে হবে।
বোটানিক্স না গড়ের মাঠ
না কি গ্রামের কোথাও!
একটা কিছু ঠিক তো হবে
হচ্ছে নাকো সেটাও।
বাছবেটা কে? দশজনেরই
দশ জায়গায় ভোট।
তর্ক থেকে হাতাহাতি
জখম, আঘাত, চোট।
মীমাংসাটা কিভাবে হয়?
পিকনিক স্পট কোথায়?
'গ্রীষ্মাবকাশ' শেষ তো হলো
ভ্রমণ বাতিল হায়!

বাপ্পা দেওঘরিয়া,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
জনার্দণ্ডী হাই স্কুল,
বৃন্দাবনপুর

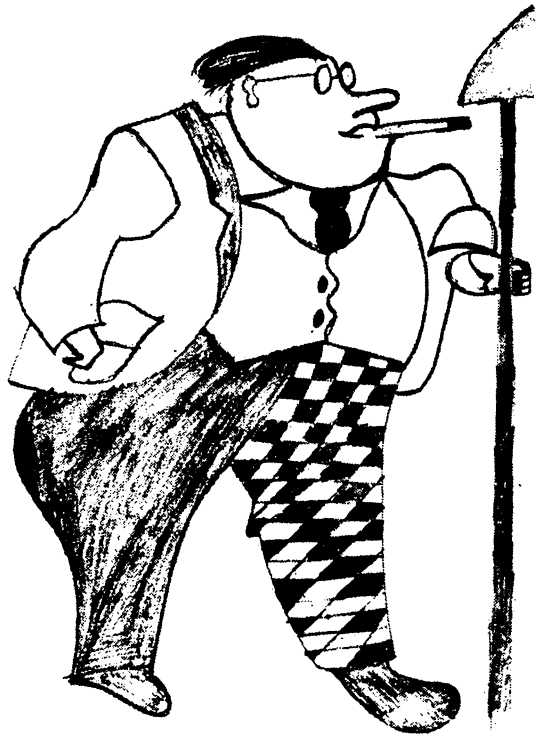

বৈশাখী দত্ত,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
সালকিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পাশ্রম, হাওড়া

পুজোর ছুটি

আসছে পুজো পাবো ছুটি
আনন্দে খাই লুটোপুটি,
পুজোয় হবে মজা ভারি
এবার যাবো মামার বাড়ি।
মামার বাড়ি অনেক দূরে
উড়িষ্যার সম্বলপুরে।
কাটবে মজায় দিনগুলি
দিদি খাওয়াবে পিঠেপুলি।
নাচছি তাই তা ধিন্ ধিন্
গুনছি বাকি আর ক'টা দিন?

শ্রেয়সী বসু,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস স্কুল

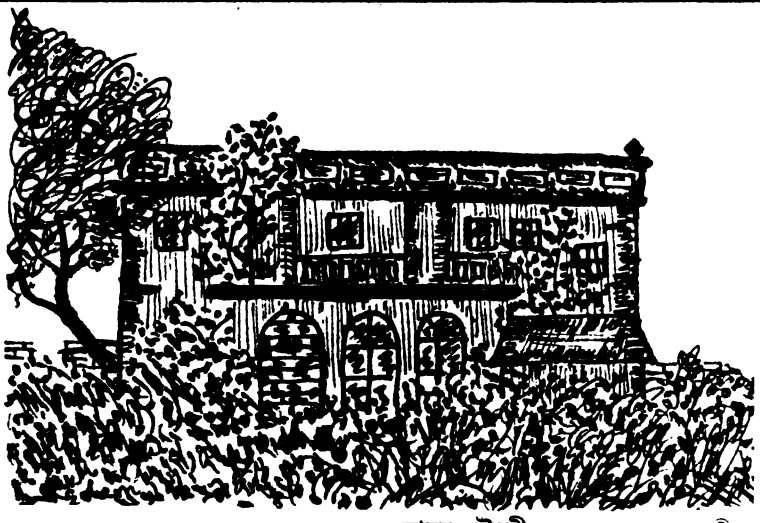

সোহম চৌধুরী, বয়স তেরো, নবম শ্রেণী,
কামরাবাদ উচ্চবিদ্যালয়
সোনারপুর, ২৪-পরগনা

মনোজিৎ মজুমদার,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
কুলটি হাই স্কুল, বর্ধমান

বেড়াল ছানা

বেড়াল ছানা, বেড়াল ছানা,
রান্নাঘরে দিসনে হানা।
চুরি করা তোর যে মানা,
এটা কি তোর নেইকো জানা!
সবার কাছেই বকুনি খাস,
তবু দুষ্টুমি তোর বারোমাস।

শুভজিৎ মুখার্জী,
বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণী,
সারদামণি শিশু নিকেতন, পুরুলিয়া

ডানা

একদিন রাতে দেখি মেলে রঙিন
ডানা,
উড়ে চলেছি আকাশপথে,
না শুনে কারো মানা।
সেদিন সেই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা
রাতে,
কথা বলছি—
তারা, গ্রহ, নক্ষত্রের
সাথে।
হঠাৎ একটি তীর এসে লাগল
আমার ডানায়,
পড়ে গেলাম আমি,
আমার নিজের বিছানায়।

সঞ্চিতা ভট্টাচার্য,
বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী,
হিজলী হাই স্কুল, মেদিনীপুর

রসায়নের শিক্ষা

রসায়ন রসায়ন
খটমট পড়া,
গাদা গাদা সংকেত
খালি মনে করা।
লাখ লাখ কোটি কত
যৌগ না আছে!
মাথা দিয়ে টেনে ধরি,
না পালায় পাছে।
জারণ ও বিজারণে
মাথা খায় কুরে,
অ্যাসিডের নাম দেখে
গেল মাথা ঘুরে।
লবণ তো খাই রোজই,
বাপরে কি ছবি!
লম্বা ঐ ঠ্যাঙ আঁকে
কোন দেশী কবি?
জৈব যৌগগুলো
বড় খটমট,
মন বলে, ছাড়ো দেখি,
চল মাঠে ছোটো।
বলি তারে, যাই বলো,
এ কথাটা জানি,
যোগ বিনা মান পাওয়া,
নেই কোনো মানি।

অরিজিৎ রায়,
বয়স ষোল, দশম শ্রেণী,
পাঠভবন, বীরভূম

আমরা বলছি

[বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা জীবন নিয়ে, সমাজ নিয়ে কি ভাবছে? তাদের জীবনের লক্ষ্যই বা কি? এইসব বিষয় নিয়েই শুরু হলো নতুন বিভাগ ***আমরা বলছি****। তোমাদের পাতার এ এক নতুন সংযোজন। শুধুমাত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই বিভাগে অংশগ্রহণ করবে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমরা কয়েকটি বিষয়বস্তু রেখেছি।* ***আজাদগড় বালিকা বিদ্যালয়****-এর ছাত্রীদের বিষয় ছিল 'পড়াশোনা বনাম খেলাধূলা'। সেরা লেখাগুলি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।]*

প্রথম

'All work and no play makes Jack a dull boy.' পুরনো ইংরাজী প্রবাদ। কিন্তু বোধকরি আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও এর মমার্থ সমানভাবে সত্য।

চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চারপাশে বইয়ের পাহাড়, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণ—পড়াশোনায় অতি অধ্যবসায়ী কোনো শিক্ষার্থীর এইরূপ একটি ছবিই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। হয়তো এদের কাছে ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার—যেকোনো রকমের খেলাধূলাই অস্পৃশ্য বা অর্থহীন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ধারেকাছেও এদের দেখা যায় না। এদের একটাই পরিচয়—ভাল ছেলে অথবা মেয়ে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে, সুস্থ শরীর এবং মানসিক বিকাশ পরস্পরের উপর খুব গভীরভাবেই নির্ভরশীল। পুরাকালে আমরা দেখেছি মহাকাব্যের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন প্রমুখদের, যাঁরা বুদ্ধি এবং কুশলতায় যেমন সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন তেমনই ছিলেন শারীরিক দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো বাল্যকালেই অতি দুরন্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন পরম জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। মূল সত্যটি এই যে, মানসিক চরম বিকাশ তখনই সম্ভব যদি সক্ষম শরীর তাতে সহায়তা করে। যে ছবি আমরা দেখতে পাই দুরন্ত 'বিলে'র সুস্বাস্থ্যে, যিনি পরবর্তীকালে মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নিজেই বাঙালীদের বলেছেন মানসিক বিকাশের জন্য শক্তির চর্চা করতে। আজ তাই দেখি বিশ্বশ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় কাসপারভ নিয়মিত সাঁতার এবং শরীরচর্চা করে থাকেন, যাতে সঠিক সময় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চালটি দিতে পারেন।

অতএব, আমরা দেখলাম পড়াশোনা এবং খেলাধূলা পরস্পরের শত্রু নয় বরং গভীর বন্ধু মাত্র। উভয়ের সংমিশ্রণেই মানুষ পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে।

স্বপ্না হাজরা
নবম শ্রেণী

দ্বিতীয়

মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা বা পড়াশোনাই হচ্ছে মানুষের চেতনার মূল চাবিকাঠি। অপরপক্ষে খেলাধূলাও হচ্ছে জীবন বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। খেলাধূলার ফলে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে। পড়াশোনায় মানুষের চেতনা এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটে এবং খেলাধূলায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই দুটোই আমাদের জীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এখন যুগ পাল্টেছে। পড়াশোনা করে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে তারপর একটা চাকরি পেয়ে জীবনধারণ করা। সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে গেলে পড়াশোনা করতেই হবে।

খেলাধূলাও এখন অর্থ উপার্জনের একটা পথ। আজকের দুনিয়ায় ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্য খেলাতে প্রচুর অর্থ রয়েছে। পড়াশোনা যেমন অর্থ উপার্জনের একটি উপায় তেমনি খেলাধূলাও আর একটি পথ। তবে খেলাধূলা করলেও পড়াশোনার খুবই প্রয়োজন আছে। প্রকৃত শিক্ষা আদর্শ মানুষ তৈরি করে। তারপর খেলাধূলা। তবেই খেলাধূলা এবং শিক্ষার পবিত্রতা বজায় থাকবে।

মৌপি দাস
নবম শ্রেণী

তৃতীয়

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে। শিক্ষা ছাড়া মানুষের জ্ঞানের বিকাশ হয় না। শিক্ষা অর্জন করতে হলে মানুষকে পড়াশোনা করতে হয়। শিক্ষার অনেক ভাগ আছে। যেমন—বিজ্ঞান শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, চরিত্র গঠন করার শিক্ষা। তেমনি শরীরচর্চাও শিক্ষার একটি অঙ্গ। শরীরচর্চা করতে হলে আমাদের নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধূলার প্রয়োজন। ছাত্ররা বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে তাদের একঘেয়েমি ও ক্লান্তি এসে যায়। এসব একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করার জন্য তাদের উচিত বিকালবেলা খেলাধূলা করা। সারাদিন বইপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের শরীর দুর্বল হয়ে যায়, এমনকি মানসিক বিকার পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রত্যেকের উচিত খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত থাকা। খেলাধূলা মানুষের বিশেষ করে শিশুদের মনকে বিকশিত করে। খেলাধূলা করলে যে পড়াশোনার ক্ষতি হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তবে একথাও ঠিক যে পড়াশোনা না করে সারাদিন খেলাধূলা করলে শুধু শরীরচর্চাই হবে, শিক্ষা বা বুদ্ধির বিকাশ হবে না। তাকে নিরক্ষরই থাকতে হবে। সুতরাং পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা চালিয়ে যেতে হবে।

টিংকি গাঙ্গুলী
নবম শ্রেণী

সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি

গত ২৩ জুন ২০০০, রবীন্দ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ঐ অনুষ্ঠানে ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিভিন্ন পুরস্কারের সঙ্গে তুলে দেওয়া হয়েছে দেব সাহিত্য কুটীরের প্রাণপুরুষ প্রয়াত সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সারা জীবন ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন। কৃতীদের পুরস্কৃত করতেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক বছর মাধ্যমিকে প্রথম তিনটি স্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁচ, তিন ও দু'হাজার টাকার বৃত্তি দেওয়া হয়। ঐদিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ঐ পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুলের সুমন কর্মকার। সে পেয়েছে মোট ৭৬২ নম্বর। দ্বিতীয় হয়েছে দু'জন—মালদা চিন্তামণি চমৎকার গার্লস হাই স্কুলের চেতনা চৌধুরী ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের অভিনন্দন ব্যানার্জি। দু'জনেরই সংগ্রহ ৭৬০ নম্বর। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অর্ণব সেন। সে পেয়েছে ৭৫৮ নম্বর।

মাননীয় মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের হাত থেকে সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তির পাঁচ হাজার টাকা ও অন্যান্য পুরস্কার নিচ্ছে ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিকে প্রথম বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুলের সুমন কর্মকার।

১৯৯৯ সালে মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও যুগ্ম দ্বিতীয় মালদা চিন্তামণি চমৎকার গার্লস হাই স্কুলের চেতনা চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের হাত থেকে সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি ও অন্যান্য পুরস্কার নিচ্ছে।

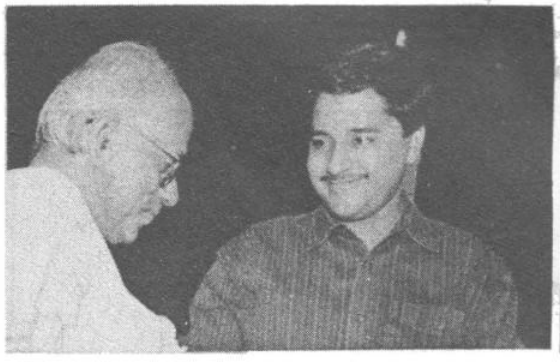

মাননীয় মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের হাত থেকে সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি ও অন্যান্য পুরস্কার নিচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের অভিনন্দন ব্যানার্জি।

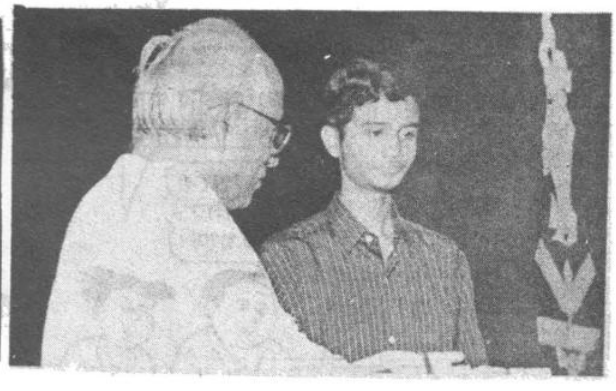

১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভকারী হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অর্ণব সেন মাননীয় মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের হাত থেকে সুবোধ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি ও অন্যান্য পুরস্কার নিচ্ছে।

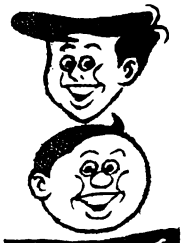

হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের খেলা
আজ্ঞে বেশ তেলরদার সাইজের মাছ উঠেছে। হাঁদা আর ভোঁদাটা এতো বড়ো মাছ দেখলে লাফাবে!
সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জঙ্গলের রাস্তা, মাছ নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতে হবে।
আঁঃ! তাইতো ভাবি মাঁছের সুঁবাস আসছে কোঁথেকে! লোঁকটা এঁকটা মাঁছ নিঁয়ে যাঁচ্ছে।
রাতে মাছের কালিয়া, ভাজা সব দিয়ে জমবে ভালো!
বাড়ি ফিরে-
দ্যাখ, হাঁদা, ভোঁদা! আজ ছিপে কি পেল্লায় মাছ ধরেছি!
মাছ কোথায় পিসেমশাই! তুমি তো মাছের কাঁটা ধরে এনেছো!
একি রে! ধরলুম মাছ হয়ে গেলো কাঁটা! তাই বলি হাত পথে হাল্কা লাগছিলো কেন!
আমার মনে হয় তুমি মেছো ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে, পিসেমশাই!
ব্যাটা ভূতকে আচ্ছা টাইট দিতে হবে।
পরে-
ঠিক আছে! তুমি কাল একটা বড়ো মাছ কিনে এনো, তারপর দেখবে আমরা কেমন মাছ দিয়ে মেছোভূত ধরবো।

সেই মতো, পরদিন বিকেলে-
দারুণ এনেছো! এবার ব্যাটা মেছোভূত দেখবে এবার মজার খেল!
- খাবে যখন ক্যাস্টর তেল!
ক্যাস্টর অয়েল
ভালো করে মাখা, হাঁদা! ভূত ভোজন বলে কথা!
ভালো করেই তেলিয়েছি রে, ভোঁদা!
ভূতটা কাল ধরা মাছ খেয়েছে, আজ কেনা মাছ খাবে।
আঁজ দুঁটো ছেঁলে আঁবার মাঁছ নিঁয়ে যাঁচ্ছে, এঁটাও খাঁবো, হেঁঃ হেঁঃ!
শুরু হয়ে গেছে রে, হাঁদা!
এর পরেই খেল শুরু হবে!
কচর্-কচ্!
কচর্-কচ্!
কিছু পরেই-
উঁরে বাঁবা রেঁ!
পেঁটের মঁদ্দি হাঁচোড় পাঁচোড় কঁরতে লেঁগেচে!
আর মাছ খাবে?
উঁরি গেঁছি রেঁ! মাঁছ আঁর খাঁবুনি আঁর এঁখেনেও থাঁকবুনি!
যা ভোজ পড়েছে সাতদিনের ধাক্কা।
টা-টা!
বায়-বায়!

হাজার বছরঃ এই মাস

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমরা দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পার হয়ে এলাম। এই হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। সাল-তারিখের বিচারে এই মাসে যেসব স্মরণীয় ঘটনার কথা জানা গেছে তার মধ্যে কয়েকটিঃ]

সেপ্টেম্বর

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ, ১২ সেপ্টেম্বরঃ তুর্কি আক্রমণকারী তৈমুরলঙ ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হলেন।

১৫৯৯, ২২ সেপ্টেম্বরঃ লন্ডনের 'ফাউন্ডার্স হল'-এ চব্বিশজন ব্যবসায়ী ভারতে বাণিজ্য করার জন্য 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' খুললো।

১৬১৫, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ বৃটিশরাজ প্রথম জেমসের দূত টমাস রো সুরাট বন্দরে নামলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনায়।

১৭৬৩, ৫ সেপ্টেম্বরঃ বিহারের উদয়নালায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম পরাজিত হলেন।

১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এদিন জন্ম হলো পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।

১৮৫৭, ২১ সেপ্টেম্বরঃ সিপাহি বিদ্রোহকালে সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী অধিকার করলো ইংরেজ ফৌজ। সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শা আত্মসমর্পণ করলেন।

১৮৭২, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ প্রিন্স রণজিৎ সিং এইদিন জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৭৬, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৮৮৮, ৫ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। দিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

১৮৯৩, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ আমেরিকার চিকাগো শহরে আয়োজিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করলেন।

১৯০৪, ১ সেপ্টেম্বরঃ মূক, বধির ও দৃষ্টিহীন হেলেন কেলার সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এদিন র‍্যাটক্লিভ কলেজ থেকে স্নাতক হলেন।

১৯০৭, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ডঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনে কুওমিনতাং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৯১৫, ৯ সেপ্টেম্বরঃ এদিন উড়িষ্যার বুড়ি বালামের তীরে বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং তাঁর সঙ্গীরা ইংরেজ পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

১৯১৬, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ স্থলযুদ্ধে সর্বপ্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করলো বৃটেন।

১৯১৬, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ সপ্তাহের একটি দিনকে 'শাকাহারী দিবস' হিসাবে ঘোষণা করার জন্য বৃটেন বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানালো।

১৯১৭, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ রাশিয়ায় নতুন রিপাবলিক গঠিত হবার পর জারকে পরিবারসহ সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হলো।

১৯২৮, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ বীজাণু ধ্বংসকারী এক ধরনের ছত্রাক (পেনিসিলিন) আবিষ্কার করলেন লন্ডনের বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।

১৯২৯, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করে এদিন প্রাণত্যাগ করলেন।

১৯২৯, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ কিংবদন্তী গায়িকা লতা মুঙ্গেসকার এদিন জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩২, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রথম মহিলা বিপ্লবী যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলি দিলেন।

১৯৩৯, ১ সেপ্টেম্বরঃ হিটলারের আদেশে জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

১৯৪২, ২১ সেপ্টেম্বরঃ প্রবাসী ভারতীয় এবং সৈনিকদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করলেন বিপ্লবী রাসবিহারীর বসু।

১৯৪২, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ মেদিনীপুরের তমলুক শহরে ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ৭২ বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১৯৪৯, ৯ সেপ্টেম্বরঃ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

১৯৫৮, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ প্রথম ভারতীয় সাঁতারু হিসেবে মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন।

১৯৮৭, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে (মাত্র সতের বছর) বিশ্বনাথ আনন্দের 'গ্রান্ডমাস্টার' খেতাব জয়।

১৯৯১, ৫ সেপ্টেম্বরঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিজিম মতবাদ পরিত্যাগ করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

১৯৯৯, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মিশাইল 'আকাশ' পরীক্ষিত হলো।

অক্টোবর

১৫৭৭, ২৪ অক্টোবর: তৃতীয় শিখগুরু রামদাস অমৃতসর শহরটির প্রতিষ্ঠা করলেন। উনি 'অমৃত সরোবর' নামে এক দীঘি খনন করিয়েছিলেন। শহরটির নামকরণ সেই দীঘির থেকেই।

১৭৫৬, ১০ অক্টোবর: অধিকৃত কলকাতা পুনরুদ্ধার করতে রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন ১০টি জাহাজ (৫টি যুদ্ধজাহাজ), ৯০০ ইউরোপীয় এবং ১৫০০ জন দেশী সৈন্য।

১৭৮১, ১৭ অক্টোবর: বৃটিশ সেনানায়ক জর্জ কর্নওয়ালিস ভার্জিনিয়ার ইয়র্কটাউনে আমেরিকার সর্বাধিনায়ক জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আমেরিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান সূচিত হলো।

১৮৪৬, ১৬ অক্টোবর: ম্যাসাচুয়েটসের এক সাধারণ হাসপাতালে সার্জেন ডঃ জন কলিনস ওয়ারেন, গিলবার্ট এ্যবট নামে এক রোগীর মুখের মধ্যে টিউমার অপারেশন করতে সর্বপ্রথম অ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগ করেন।

১৮৫১, ২৪ অক্টোবর: কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু হলো।

১৮৬৭, ২৮ অক্টোবর: আয়ারল্যান্ডে ভগিনী নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করলেন।

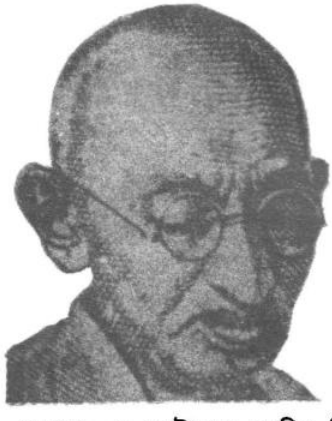

১৮৬৯, ২ অক্টোবর: জাতির পিত মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন।

১৮৯৩, ৬ অক্টোবর: প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৫, ১৬ অক্টোবর: লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গদেশ দু'ভাগ করা হলো।

১৯০৬, ৩ অক্টোবর: S O S আন্তর্জাতিক বিপদ সংকেত হিসেবে সারা পৃথিবীতে গৃহীত হলো।

১৯১১, ১০ অক্টোবর: চীনে মহাবিপ্লবের সূত্রপাত। ফলশ্রুতি দু'হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো জনগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

১৯১৪, ২৪ অক্টোবর: বিশ্বে সর্বপ্রথম রঙিন ফটোগ্রাফ প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলো।

১৯৩৪, ২১ অক্টোবর: চীনা কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং-এর 'লং মার্চ'।

১৯৪৩, ২১ অক্টোবর: সিঙ্গাপুরে গঠিত হলো আজাদ হিন্দ সরকার।

১৯৪৩, ২৩ অক্টোবর: আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে সম্পূর্ণ মহিলা সেনানীদের নিয়ে নেতাজী গঠন করলেন 'রানী অফ ঝান্সি ব্রিগেড'।

১৯৪৫, ২৪ অক্টোবর: বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ কাজ শুরু করলো।

১৯৪৭, ২২ অক্টোবর: পাকিস্তানী হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করে।

১৯৪৭, ২৭ অক্টোবর: কাশ্মীরের রাজা হরি সিং কাশ্মীরকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার চুক্তিতে সই করলেন।

১৯৫০, ৭ অক্টোবর: মাদার টেরিজা কলকাতায় 'মিশনারি অফ চ্যারিটিজ' প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯৫৮, ১ অক্টোবর: ভারতে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক প্রথা চালু হলো।

১৯৫৯, ২৬ অক্টোবর: সোভিয়েত মহাকাশযান 'লুনিক-৩'-এর পাঠানো ছবি থেকে মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদের উল্টোপিঠের অন্ধকার দিকটা দেখতে পেল।

১৯৬২, ২০ অক্টোবর: ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা আক্রমণ।

১৯৬৮, ১৬ অক্টোবর: হরবিন্দ খোরানা মেডিসিন এবং ফিজিওলজিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯৭১, ২৫ অক্টোবর: চীনকে রাষ্ট্র-সংঘের সদস্যপদ দেওয়া হলো এবং তাইওয়ানকে বহিষ্কার করা হলো।

১৯৮৩, ১৯ অক্টোবর: সুব্রমানিয়াম চন্দ্রশেখরকে আমেরিকান বিজ্ঞানী উইলিয়াম ফাউলার-এর সঙ্গে যৌথভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো।

১৯৮৪, ৩ অক্টোবর: ভারতের দীর্ঘতম যাত্রাপথের রেলগাড়ি হিমসাগর এক্সপ্রেস কন্যাকুমারী রেলস্টেশন থেকে জম্মু তাওয়াই-এর উদ্দেশে রওনা হলো।

১৯৮৪, ৩১ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলেন তাঁরই দেহরক্ষীর হাতে।

১৯৮৯, ৫ অক্টোবর: তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯৯৯, ২৯ অক্টোবর: সুপার সাইক্লোনে ওড়িশার পারাদীপ, ভুবনেশ্বর, গঞ্জাম জেলা সমেত বহু এলাকায় প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি।

ফিরে দেখা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু একটি স্পর্শ

আঠারোশো আটানব্বই সালের ২৫ মার্চ।

বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে একটি ঘর। কুশাসনে বসে আছেন তুষারশুভ্র এক আইরিশ তরুণী—মিস মার্গারেট নোবল। তাঁর সামনে মৃগচর্মের আসনে হিমালয়ের মতো শান্তমূর্তি ভারত-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

রুদ্ধদ্বার সেই নিভৃত কক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিমের বিজ্ঞানমনস্ক মেয়ে মার্গারেট নোবলকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন স্বামীজী। দীক্ষার পর তাঁর নাম দিলেন নিবেদিতা।

মিস নোবলের সেদিন শুধু নামান্তর হয়নি, এক দেহে হয়েছিল 'জন্মান্তর। নোবল থেকে নিবেদিতা। পাশ্চাত্য থেকে ভারত-কন্যা। তবে তার জন্যে দরকার আরও কিছু সময়ের।

সদ্য-দীক্ষিতা শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন একটি কবিতা লিখেছিলেন। ইংরেজিতে লেখা সেই কবিতার মধ্যে দিয়ে স্বামীজী তাঁর শিষ্যার জন্যে যা যা প্রার্থনা করেছিলেন, তার সমস্তই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ-নিবেদিতার মধ্যে। সেদিন নিবেদিতাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে সেই মেয়ে হয়ে উঠবেন বিংশ শতাব্দীর এক অনন্যা নারী, যে নারীর অপরূপ মূর্তি স্বামীজী তাঁর আশীর্বাদী কবিতায় এঁকেছিলেন। কেমন সেই নারীমূর্তি? স্বামীজীর লেখা এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে আমরা তাকে দেখতে পাবো:

"তোমার হৃদয় হোক জননীর মতো,
বীরের মতো হোক তোমার পণ।
যে-কোমলতা, যে-মধুরতা আছে
মধুরতর কুসুমের নিঃশব্দ বিকাশে,
যে-দীপ্তি যে-শক্তি আছে
মঙ্গল আরতির চম্পক শিখায়,...
যে-বীর্য জানে আদেশ করতে,
আর ভালোবাসায় জানে আদেশ
স্বীকার করতে...

যে-মন স্বপ্ন দেখে,
আর যে-মন অবিচল ধৈর্যে
থাকে স্থির...
যে আলো আছে বৃহৎ আকাশে
আর যে আলো আছে ক্ষুদ্রতম
অণুতে,
এই সব, এবং আরো কিছু
যা রইলো আজ আমার চাওয়ার
বাইরে,
জননীর আশীর্বাদে তুমি হও তার
চির-অধিকারিণী।"

সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাঁর আন্তঃদৃষ্টিতে ভারত-কন্যা নিবেদিতার যে রূপ দেখে নিয়েছিলেন দীক্ষার দিনেই, গোটা বিশ্বের সামনে তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বেশ কয়েক বছর পরে।

দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নামান্তর হলেও জন্মান্তর কিন্তু তখনই হয়নি। তার জন্যে দরকার ছিল একটি স্পর্শের। সে স্পর্শ কী আর সহজে মেলে! সে স্পর্শের মূল্য অপরিসীম। তাকে চোখের জলে অর্জন করতে হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের গঙ্গার তীরে মা ভবতারিণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ গুটিকয়েক তরুণ শিষ্যকে নিয়ে যে ধর্মবিপ্লবের সূচনা করেছিলেন সেদিন তা শুধু দক্ষিণেশ্বর আর বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, ধর্মবিপ্লবের সেই আলো শুধু বাংলা বা ভারতের প্রয়োজনে নয়, জ্বালা হয়েছিল বিশ্বের প্রয়োজনে। গোটা বিশ্ব আজ তা উপলব্ধি করছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের প্রয়োজনে। সম্প্রদায়গত নয়, জাতিগত নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন মানবধর্মকে। তারই ধ্বজা বিশ্বময় উড়িয়ে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের কাছে বলে গিয়েছিলেন, এমন একদিন আসবে, যেদিন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন এমন শক্তির অধিকারী হবে যে, তার একটি স্পর্শে জেগে উঠবে মানুষের দিব্য-চেতনা।

নিবেদিতার মধ্যে সেই দিব্য-চেতনাই স্বামী বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুলেছিলেন শুধুমাত্র একটি স্পর্শে। সেই স্পর্শ কিন্তু নিবেদিতা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাননি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ভগিনীকে তা অর্জন করতে হয়েছিল চোখের জলে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর।

মিস মার্গারেট নোবল। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জাগরণের লগ্নে তিনি গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ। জীবনের বৃহত্তর সংজ্ঞায় জেগে উঠেছিল তাঁর শিক্ষিত মন। লন্ডনে ওয়েস্ট এন্ডে স্টার্ডির বৈঠকখানায় আর চৌদ্দজন কৌতূহলী শিক্ষিত ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন

স্বামী বিবেকানন্দকে। শুনতে চেয়েছিলেন ভারত-সন্ন্যাসীর বক্তব্য। মিস নোবলের বয়েস তখন আঠাশ। স্বামী বিবেকানন্দ সবে তিরিশ পেরিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দর তেজোদীপ্ত অপরূপ মূর্তি, তাঁর মনোহর বাচনভঙ্গি, প্রতিভাদীপ্ত ভাষণ শুনে অন্য সকলের মতো মিস নোবলও অভিভূত। মিস নোবল বিস্মিত, স্তব্ধভাবে শোনেন সেই ভাষণ। স্বামীজী বিশ্বের ইতিহাসের কথা এমনভাবে বলছেন যেন প্রত্যেকটি ঘটনা তিনি নিজে দেখে এসেছেন। ওঁর মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনে মার্গারেট অবাক হয়ে ভাবেন, এ কোন ভারতবর্ষ! এই ভারতবর্ষের কথা তো তিনি জানেন না। সন্ন্যাসীকে বোঝার চেষ্টা করেন। পারেন না। তবু তাঁর পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মনে ওঠে গভীর আলোড়ন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে যেন স্বীকার করতে পারেন না। আঘাত লাগে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন মিস মার্গারেট নোবল।

কিছুই অজানা ছিল না স্বামী বিবেকানন্দর। দেশে ফিরে আসার পর ভারতে আসার জন্যে তিনি আমন্ত্রণ পাঠালেন মার্গারেট নোবলকে। ২৮ জানুয়ারি মিস নোবল ভারতে এলেন। মার্চ মাসে পেলেন মন্ত্রদীক্ষা।

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দর কথার মধ্যে দিয়ে তিনি যে ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন, এদেশে পা দিয়ে তিনি দেখলেন আর এক ভারতবর্ষকে। এখানে পদে পদে দৈন্য, কুসংস্কার, মানবতার গ্লানি দেখে মার্গারেটের শিক্ষিত মন ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। তিনি আরও বড় ধাক্কা খেলেন স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে। লন্ডনে যে স্বামীজীকে তিনি দেখেছিলেন, বেলুড়ে দেখলেন আর এক বিবেকানন্দকে। এই কথা মনে রেখে পরে তিনি লিখেছিলেন, ভারতে এসে তাঁকে দেখলাম... "in all the fruitless torture and struggle of a lion caught in a net."

মাতৃভূমি পরাধীন। দেশের মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা স্বামীজীকে অস্থির করে তুলেছিল। তাঁর স্বপ্ন মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন, অশিক্ষা এবং নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা কিছুই হচ্ছে না। তাই স্বামীজী পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো ছটফট করছেন। স্বামী বিবেকানন্দর সেই বেদনার্ত, বিক্ষুব্ধ মূর্তি দেখে সদ্য দীক্ষিতা নিবেদিতা একদিন সরল মনে তাঁর গুরুকে বলেছিলেন, চলুন আমরা ফিরে যাই। আপনার স্থান এখানে হতে পারে না, আপনার উপযুক্ত স্থান ইউরোপ। শুনে স্বামীজী ভেঙে পড়েছিলেন অট্টহাস্যে।

স্বামীজী জানতেন, তাঁর মানস-কন্যার নামান্তর হয়েছে, চেতনান্তর হয়নি। কারণ তাঁর মধ্যে তখনো স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার অভিমান পুরো মাত্রায় ছিল। এই অভিমান না গেলে, পাশ্চাত্য বিদ্যা-বুদ্ধির দর্প না ঘুচলে ভারত-ধর্মের শাশ্বত-সত্যে অনুরঞ্জিত হবে কী করে নিবেদিতার মন? এক আধার থেকে অপর আধারে যখন শক্তিকে অনুচালিত করতে হয় তখন তার গ্রহণের দিকটাও শক্তি ধারণের উপযোগী হওয়া চাই। গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু নিবেদিতার মধ্যে তখনো পাশ্চাত্য অভিমানের ঘট পূর্ণ হয়ে আছে। তাই তিনি গুরুকে নিয়ে ইউরোপে চলে যেতে চেয়েছিলেন।

শুরু হলো নিবেদিতার পরীক্ষা। বড় কঠোর, বড় নির্মম সেই পরীক্ষা। নিবেদিতা অনুভব করেন, গুরু যেন দূরে সরে যাচ্ছেন। শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-জপ সবই তিনি নিয়মিত করছেন কিন্তু কিসের যেন একটা অভাববোধ তাঁকে পীড়িত করে। সব কিছু অর্থহীন মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতেন না। নিবেদিতার মধ্যে তখনো ছিল নারীর আত্মাভিমানের রেশ, তাই ভাবলেন—গুরু তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। তাঁর মধ্যে তখনো এ বোধ জাগেনি যে গুরু অদৃশ্য থাকলেও সব সময় তাঁকে ঘিরে আছেন। অবশেষে মর্মান্তিক যাতনায় অন্তর মুহ্যমান হয়ে এলো নিবেদিতার, নিরুদ্ধ সেই কষ্ট কান্না হয়ে ঝরে পড়ল।

এমনি সময় নিবেদিতা শুনলেন, গুরু হিমালয়-পরিভ্রমণে যাচ্ছেন। আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তাঁর হৃদয়, কঠোর গুরু তাঁকে নিশ্চয় ফেলে যাবেন। কিন্তু ধীরামাতা তাঁকে খবর দিলেন—স্বামীজী বলেছেন, নিবেদিতাও সঙ্গে যাবে।

বেলুড় থেকে এত দূরে এসেও স্বামী বিবেকানন্দের বাহ্যিক গাম্ভীর্যের কোনো পরিবর্তন হলো না। প্রয়োজন ছাড়া নিবেদিতার সঙ্গে কথাও বলেন না। নির্জন অরণ্যে গাছের ছায়ায় স্বামীজী শিষ্যাদের সঙ্গে গুরুতত্ত্ব আলোচনা করেন। নিবেদিতা আপ্রাণ চেষ্টা করেন গ্রহণ করতে, বুঝতে। কিন্তু কিসের অভাবে

যেন তা মর্মে পৌঁছায় না। আগে তর্ক করতেন। এখন করেন না। না বোঝার জ্বালা তাঁকে দগ্ধ করে। কান্নায় ভেঙে পড়েন নিবেদিতা। ধীরামাতার নজরে পড়ে নিবেদিতার সেই মর্মছেঁড়া কান্না।

সহ্য করতে পারেন না ধীরামাতা। স্বামীজীকে বলেন, নিবেদিতার এ কান্না যে চোখে দেখা যায় না। ও কী শান্তি পাবে না?

শান্তকণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, আজ বোধহয় চতুর্দশী তিথি?

হ্যাঁ, শুক্লা চতুর্দশী।

স্বামীজী উঠে দাঁড়ান। বলেন, আজ সারাদিন, সারারাত আমি হিমালয়ের গুহায় থাকবো। কাল পূর্ণিমায় আবার ফিরে আসবো তোমাদের কাছে।

পরের দিন। হিমালয়ের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ। অরণ্য সেজেছে যেন অপরূপ সাজে। নিবেদিতা অপেক্ষা করে আছেন গুরুর প্রত্যাগমনের। ঘরে নয়, পথের প্রান্তে। নির্জন সেই আরণ্যক পরিবেশে কী এক অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গে ঘন ঘন কেঁপে উঠছে তাঁর দেহ। কেঁপে উঠেছে তাঁর গভীরতম চেতনা। বুঝতে পারেন না, কেন এমন হচ্ছে।

সহসা দীর্ঘ ছায়া ফেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন এক দিব্যপুরুষ। আকাশের সমস্ত আলো যেন তাঁর দেহ আহরণ করে নিয়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গের মতো। শান্তকণ্ঠে তিনি বলেন, নিবেদিতা, কন্যা আমার।

গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়েন নিবেদিতা। উঠে দাঁড়ান গুরুর আদেশে।

সেই দিব্য মুহূর্তে নিবেদিতার মাথায় হাত রাখলেন গুরু।

স্বামী বিবেকানন্দর স্পর্শ। মাত্র একটি স্পর্শ।

সেই স্পর্শে জেগে উঠল নতুন এক সত্তা, হিরণ্ময়-পাত্রে ঢাকা জ্ঞানের স্বর্ণ-শিখায় জেগে উঠল নতুন এক নারী। এক দেহে দেহান্তর হলো নিবেদিতার। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা।

সেই দিব্য মুহূর্তের কথা নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন,

"...Long, long ago, Sri Ramakrishna had told his disciples that the day would come when his beloved Naren would manifest his own great gift of bestowing knowledge with a touch. That evening at Almora I proved the truth of his prophecy."

(অনেক, অনেকদিন আগে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের কাছে বলে গিয়েছিলেন, এমন একদিন আসবে, যেদিন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন এমন শক্তির অধিকারী হবে যে তার একটি স্পর্শে জেগে উঠবে মানুষের দিব্য-চেতনা। সেদিন আলমোড়ার সেই সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে আমার জীবনে তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়ে ওঠে।)

নাট্যে কথামৃত

জ্যোতিভূষণ চাকী

উঃ আঃ

[কর্তাবাবু শুয়ে আছেন। উঃ আঃ করছেন। পিঠে একটা বিষফোঁড়া হয়েছে। টনটন করছে। গিন্নীর প্রবেশ।]

গিন্নী—নতুন এক বুলি ধরেছ দেখছি।

কর্তা—তা ধরেছি বটে।

গিন্নী—তা হলোটা কী? একটু ঝেড়ে কাশবে?

কর্তা—একজন বড্ড জ্বালাচ্ছে।

গিন্নী—জ্বালানোর জন্যে ওই একজনকেই পেয়েছে সবাই।

কর্তা—তা বটে তা বটে। উঃ আঃ।

[গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল—কর্তাবাবুর কি শরীল খারাপ?

কর্তা—না রে গোকুল। উঃ আঃ। একটু শুয়ে আছি, শুয়েও স্বস্তি নাইরে।

গোকুল—ঠিক কয়েছেন কর্তাবাবু। সোয়াস্তি নাই। জনা তিনেক অপিক্ষে করতেছে—হারান, গুবিন্দ আর হরিদাস। আমি বলি গিয়ে কর্তাবাবু আসতি পারবেন না। শরীল মন্দ।

কর্তা—না না। আমি যাচ্ছি। উঃ আঃ।

[কর্তা উঠলেন, বৈঠকখানায় এলেন। তিনজন উঠে দাঁড়াল]

কর্তা—বোসো, সবাই বোসো। উঃ আঃ।

[সবাই বেঞ্চে বসল]

কর্তা—হারান কী মনে করে?

হারান—আজ্ঞে, আমবাগানটা যদি এ বছর আমাকে দেন—

কর্তা—তুমি কোন বাগানটার কথা বলছ? উঃ আঃ।

হারান—ময়নাদীঘির পাড়ে যেটা রয়েছে।

কর্তা—সাধুখাঁ তো তোমার আগে একবার বলে রেখেছে। দেখি ও যদি আগ্রহ না দেখায়—উঃ আঃ—তোমাকেই দেব।

[গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে]

কর্তা—বলো গোবিন্দ তুমি কি বলতে চাও।

গোবিন্দ—আজ্ঞে আপনি তো খাঁ-পুকুর পাহারা দেওয়ার ভার আমার উপর দেছেন।

কর্তা—তা তো দিয়েছি।

গোবিন্দ—চ্যাংড়ারা মাছ ধরে ক্যানে? আমি উঠে যেতে বললে বলে—বাবুকে বল গে যা। এত সাহস।

কর্তা—আর তোর সাহস নেই?

গোবিন্দ—আপনি বললি ওই ছ্যামড়াদের প্যাঁদায়ে—

কর্তা—থাক গোবিন্দ। অতটা দরকার নেই। উঃ আঃ। একটু হেই হুই করবি, ব্যস।

[হরিদাসের দিকে তাকিয়ে]

কর্তা—এবার বলো হরিদাস, তোমার কী সমস্যা।

হরিদাস—সমিস্যে তো একটা নয় বাবুমশাই, সমিস্যে অনেক, তয়, আপনার উঃ আঃ শুনে মনে কয় যন্তন্না হতেছে।

কর্তা—তুমি ঠিকই ধরেছ হরিদাস। পিঠে একটা বিষফোট হয়েছে। ওটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। ঠিক আছে। আজ উঠি। সব শুনব পরে।

তিনজনে—আজ্ঞে, সেই ভালো।

[সকলের প্রস্থান]

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক—কর্তাবাবু সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল পিঠের ফোঁড়াটার দিকে। ঈশ্বরকেও এইভাবেই ভাবতে হয়। কাজকর্ম সবই চলছে, তবু কাজের জগতের মধ্যেই তাঁকে যেন ভুলে না যাই।

[বিবেকের প্রস্থান]

অনধিকার প্রবেশ

পার্থসারথি চন্দ্র

পাশের পাড়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল টীম জাতীয় সংঘ 'মুঘল বাদশা' নাটক করে পাড়ার মানুষদের তাজ্জব বানিয়ে দিল। সেদিন থেকেই বগলাদার মাথায় ঐ এক চিন্তা, আমাদেরও কিছু করতে হবে। পরদিন মাঠে ফুটবল নিয়ে কাউকে দাপাদাপি করতে দেখা গেল না। রকে বসে দলবল নিয়ে ঘোর আলোচনা চলছে। ছিদামের আলুর চপ আর মুড়ি শেষ হয়েই যাচ্ছে। বগলাদার এক কথা, তিন সপ্তাহের মধ্যেই নাটক নামাতে হবে। বেশ জবরদস্ত দেখে একটা নাটক বাছতে হবে।

আমরা সবাই উৎসাহী হয়ে উঠলাম। ঠিক হলো, 'বাংলার শেষ নবাব' নাটকটা করা হবে। দুই-একদিনের মধ্যেই পার্ট লিখে রেডি হয়ে গেলাম সবাই। এবারে রিহার্সাল দেওয়ার পালা। কোথায় দেওয়া যায়?

হ্যাঁরে সন্তা, তোদের বাড়ির ছাদে করা যাবে না?

সে কি? আমাদের বাড়িতে আবার ছাদ দেখলে কবে?

ও নেই বুঝি? তাহলে খগা, তোদের বাড়ির উঠোনটা তো চমৎকার!

আমার মেজদাটি কিন্তু চমৎকার নয়। নাটক করছি শুনলেই তেড়ে আসবে। বছর বছর তো তোমার কৃপায় ফেল মারছি।

অ, বিমর্ষভাবে বললে বগলাদা। জগার বাড়িতে আবার ব্রহ্মচারী গুরুদেবের আগমন, ভক্তজনের যাওয়া-আসা! তাহলে কোথায় যাওয়া যায় বল তো?

সবাই একপ্রকার হাল ছেড়ে দিয়ে ছিদামের চপের সদ্‌গতি করছিলাম। হঠাৎ বগলাদা 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠে আমার ঠোঙা থেকে ছোবল মেরে চপটা তুলে নিয়ে দ্রুত গলাধঃকরণ করে বলল, পশ্চিমের ঐ ভাঙা জমিদারবাড়িতেই আমাদের রিহার্সাল চালাব।

সবাই একসঙ্গে প্রথমে লাফিয়ে উঠলেও, আমি আর সন্তা দমে গেলাম। আমি বললাম, না বগলাদা, রেহ্‌সাল দিতে গিয়ে ভূতের হাতে প্রাণ দিতে পারব না। সন্তাও আমাকে সায় দিয়ে বলল, খগা ঠিকই বলেছে বগলাদা। আমার পিসেমশাই বলেছে, ও বাড়িতে ভূত আছে। দিনের বেলাতেই ও বাড়ির ছায়া কেউ মাড়ায় না।

আরে রেখে দে তোর ভূত। ও সব আমি বিশ্বাস করি না, সব বোগাস। তাছাড়া তোরা কোথায় সিরাজ-উদ্‌-দৌল্লা আর নবাবের দুর্ধর্ষ সেনাদের অভিনয় করবি, তোদের এখন এমন ভয় মানায়? বগলাদা বীরবিক্রমে বলে।

তা যা বলেছ বগলাদা, এখন এই স্থান-সংকটের দিনে অমন শান্ত পরিবেশ তো তপোবনের মতো। বেশ জম্পেশ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলব, আমি বাংলার নবাব, বাংলার মাটিতে নবাবের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবো—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর...। আবেগ ধরে রাখতে পারে না সন্তা।

তাইলে কাল থিক্কা শুরু হইব? জগা উত্তেজিত ভাবে বলে।

হ্যাঁ কাল থেকেই। দ্বিতীয় রাউন্ডের চপ-মুড়ির অর্ডার দিতে দিতে বগলাদা বললে।

২

পরদিন বিকেল থাকতে থাকতেই আমি জমিদারবাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। যখন পৌঁছলাম, দেখি সবাই বাড়ির ভেতরে যে সুবিশাল উঠোন রয়েছে, তার মাঝখানে শতরঞ্জি পেতে রিহার্সাল আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি এসে পৌঁছতেই সবাই হইহই করে উঠল।

খগা, কাল থেকে এত লেট করবি না, খবরদার। সন্ধ্যের আগেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, নইলে ভূত না হোক সাপের ছোবলে প্রাণ যাবে। বগলাদা স্ক্রিপ্ট ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললে।

যাই হোক, আমি গিয়ে শতরঞ্জির ওপর বসলাম। চারদিকটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলাম। উঠোনের স্থানে স্থানে বুনো তুলসী আর শেয়ালকাঁটার ঝোপ। হলুদ ফুল ফুটে জায়গাটা কেমন জ্বলজ্বল করছে। দোতলা মহল। নিচের তলার সবকটি ঘরের দরজা বন্ধ। পেল্লায় সাইজের সব দরজা। সিঁড়ি চলে গেছে দোতলায়। দোতলার ঘরগুলো কোনোটা ভাঙা, কোনোটা বা খোলা।

দোতলার বারান্দায় প্রাচীন আমলের কিছু ঝাড়বাতি এখনও সিলিং থেকে ঝুলছে। বাদুড় আর পায়রার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য হয়ে গেছে বাড়িটা। চামচিকের উৎপাতও কম নয়। একটা ভয়ঙ্কর দেখতে গিরগিটি উঠোনের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে একটা উঁচু মতো বেদিতে বসে বসে কটমট করে আমাদের দেখছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গিরগিটিটা অমন বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছে কেন?

জোর করে মন ফিরিয়ে নিলাম। রিহার্সাল তখন বেশ জমে উঠেছে। সন্তাকে সেনাপতির পার্ট দেওয়া হয়েছে। বীরবিক্রমে চেঁচাতে চেঁচাতে সে হাতে ধরে থাকা কাগজ দেখে পাঠ বলছে, রে পাষণ্ড নরাধম, শ্বেত রাক্ষসের ন্যায় আসিয়াছ গ্রাসিতে বাংলাকে? জান না কি বাংলার শক্তির ইতিহাস...এখনও পাও নাই নবাবের শক্তির বারতা...

জানিয়াছি, আমি সকল কিছুই জানিয়াছি...টবু একবার বাবিয়া ডেকো। বাংলার সম্পত্তি যা কিছু পাইব, ন্যায্য ভাগ পাইবে...কুটিল হেসে জগা বলে।

ওরে ওরে নরাধম, উৎকোচ দিতে চাহ নবাবের সেনাপতিরে? হেন আস্পর্ধা দেখে রাগে অঙ্গ কাঁপে থরো থরো...ওটা কি রে জগা?

রিহার্সালের ছন্দপতন হয়। সবাই ফিরে দেখি, সন্তা বিস্ফারিত নেত্রে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বগলাদা এতক্ষণ ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে নাটকের মহড়া দেখছিল আর আসন্ন অনুষ্ঠানে 'বাংলার শেষ নবাব'-এর সফলতার স্বপ্ন দেখছিল। এখন হঠাৎ করে সবাই থেমে যেতেই বিরক্তভাবে খিঁচিয়ে বলল, কী দেখছিস ওদিকে হাঁ করে?

আমরা ছাড়াও এই বাড়িতে আরও কেউ আছে বগলাদা। আমি দেখলাম... রুদ্ধকণ্ঠে সন্তা জানায়।

কী দেখলি? তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বগলাদা জিজ্ঞাসা করে।

দেখলাম, সর্বাঙ্গে কাপড় ঢাকা একটা ছায়া। সিঁড়ির ঐ কোনা থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে গেল।

তাহলে তার এখন দোতলায় থাকার কথা! বগলাদার কাছাকাছি সরে এসে আমি বললাম।

কিন্তু যতদূর জানি, এ বাড়িতে কেউ থাকে না, আর থাকবেই বা কেন? এটা কি একটা বাসযোগ্য জায়গা? বগলাদা বলে।

একবার দোতলায় যাইবা? জগা চিন্তিতভাবে বলে।

ঠিক আছে চল, কিন্তু সন্ধ্যে নেমে আসছে...বগলাদা দমে যায়।

ত কি হইছে? এখনও ত রাত নামে নাই।

নিউ বেঙ্গল প্রেসের

কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনী

রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

এলেম নতুন দেশে ১২.০০

রাধারমণ রায়

অদ্ভুত গোয়েন্দা- ১ম খণ্ড ১৮.০০

ঐ - ২য় খণ্ড ২০.০০

শঙ্কর রুদ্র

ভজগোবিন্দের অ্যাডভেঞ্চার (২য়) ১৮.০০

শচীন দাস

আবিষ্কারের গল্প ২০.০০

শিশিরকুমার মজুমদার

পাতালপুরীর অভিযান ২৫.০০

মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ২৫.০০

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

(১-৪ — ৩০.০০, ৫,৬—২৮.০০)

সংকর্ষণ রায়

কালনাগিনীর আক্রোশ ১৫.০০

অষ্টভুজা রহস্য ২০.০০

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

রক্তমাখা গুপ্তধন ২০.০০

সুন্দরবনের শয়তান ২০.০০

সুভাষ ধর

পুলিসের ডায়রী থেকে ৩০.০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

☎ ২৪১ ২২৪৩

ঐ নারীমূর্তি আমাদের দিকে ফিরে তাকাল।

বেশ চল।

দল বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। কিছুটা ওঠার পরই দেখলাম, সিঁড়িটা বিচ্ছিরি রকমের ভেঙে গেছে। যতদূর পর্যন্ত উঠে এসেছি, তারপর থেকে চার-পাঁচটা ধাপ একদম নেই। একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে কারও ওপরে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়।

লাফ দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় রে জগা, কেননা লাফ দিতে গেলে তাকে রীতিমতো অলিম্পিকের লং জাম্পে সোনাবিজয়ী হতে হবে। কিন্তু তাতেও তো দৌড়ে আসার দরকার! হ্যাঁরে সন্তা, সে কি দৌড়ে গিয়েছিল?

না গো বগলাদা, খুব ধীরে ধীরে হেঁটে গেল দেখলাম। একবার আমাদের দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েও ছিল।

এইবারে আমাদের সবার মনে একটা চাপা আতঙ্ক দানা বাঁধতে লাগল। এদিকে রীতিমতো সন্ধ্যা নেমে গেছে। আকাশে মেঘও করেছে। আমরা সবাই কাছাকাছি সরে এলাম।

জগা বলল, আমার মনে হইতেছে, সন্তা ভুল দ্যাখ্‌ছে। মিছামিছি আমরা ভয় পাইতাছি। আজকে বরং বাড়ি চইলা যাই, কাল সকাল সকাল আইস্যা ঘরগুলানরে পরখ কইরা দেখুম।

তা যা বলেছিস, আমাদের সঙ্গে পাঁয়তারা মারতে এলে, তাকে এমন...

বগলাদার কথা শেষ হলো না একটা মৃদু নূপুরধ্বনি। যেন কেউ ওপর থেকে নিচে নামছে। আমাদের কান খাড়া হয়ে উঠল, ততোধিক খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম। বগলাদা জগাকে চেপে ধরে বলল, ওরে বাবা, এ যে দেখি ভুতুড়ে কাণ্ড!

আমি বললাম, বগলাদা, লেট করলে আমরাও এক্ষুণি ফ্ল্যাট হয়ে যাব, ভালো চাও তো দৌড় লাগাও।

ছুটবো কি করে, আমার তো...

চেয়ে দেখি, বগলাদার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। সন্তা বলল, তখনই বলেছিলাম বগলাদা জায়গাটা ভালো নয়, চল এবারে মানে মানে কেটে পড়ি।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে নেমে এলাম। উঠোনে এসে দোতলার বারান্দার দিকে তাকালাম। জনশূন্য বারান্দার ঝাড়বাতিগুলো দুলছে। অথচ একটুও বাতাস বইছে না। হঠাৎ আমাদের সবার চোখ চলে গেল দক্ষিণের শেষ প্রান্তে সেই ভাঙা বেদিটার দিকে। ওটা কিসের বেদি, তখন খেয়াল করিনি, এখন দেখি, কে এক রমণী বেদির ওপর ফুল দিচ্ছে। আধো অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, তার পরনে মহামূল্য পোশাক, অঙ্গে সোনার অলঙ্কার, যেন কোন এক রাজরানী!

হঠাৎ ঐ নারীমূর্তি আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর ভর্ৎসনা মাখানো চাহনি! দেখেই তো আমরা শতরঞ্জি, নাটকের স্ক্রিপ্ট, চানাচুরের প্যাকেট সব ফেলে রেখে চোঁ চাঁ দৌড় লাগালাম। দৌড়তে দৌড়তে বার বার ভেসে উঠছিল সেই চাহনি। যেন জমিদারবাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে তিরস্কার করছে।

পাগলের মতো দৌড়ে পাড়ায় ঢুকতে দেখে, ছিদাম আর তার দোকানে বসে থাকা লোকজনেরা ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল, কিরে, তোদের হলো কি? অত হাঁপাচ্ছিস কেন?

আমরা কিছুটা ধাতস্থ হয়ে, ধীরে ধীরে সব বললাম। নেপাল-মাস্টার পাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ। তিনি ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, ঐ বাড়িতে যাওয়া তো বারণ, তোমরা গেলে কেন? তোমাদের মতো বয়সে, আমিও একবার ওখানে গিয়েছিলাম। ঐ একই দৃশ্য দেখেছিলাম। তোমাদের ভাগ্য ভালো তাই দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এসেছো। কিন্তু আমি দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিলাম। শেষ রাতে আমার জ্যাঠামশাই পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে আমাকে ওখানে আবিষ্কার ও উদ্ধার করে। সেদিন হয়তো সাপের কামড়েই আমি মারা পড়তাম! যারাই ওখানে গিয়েছে অজ্ঞান হয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে। আর তোমরা কিনা ঐ জায়গাটাই রিহার্সালের জন্য বেছেছো! যাকগে, কাল থেকে আমার বাড়ির উঠোনেই তোমরা মহড়া দিও।

আমরা তখনও ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। ছিদাম আমাদের যত্ন করে গরম চা, চপ আর ঝালমুড়ি দিলে। বগলাদার পায়ের কাঁপুনি তখনও বন্ধ হয়নি। তার মধ্যেই চপে কামড় দিয়ে বললে, আরেক রাউন্ড ছিদাম, আর আমারটায় ঝালটা একটু বেশি দিস।

ছবিঃ সুফি

সৌরভের সামনে সমস্যার পাহাড়

শা. প্রি. ব.

সুনীল গাভাসকার কত বুদ্ধিমান তা পরিষ্কার বোঝা গেল কপিলদেবের প্রস্থানের পর। অনেক দুঃখে, অনেক কষ্টে, যে ক্রিকেট হরিয়ানার উদ্বাস্তু দরিদ্র ঘরের ছেলেটিকে কপিলদেব করেছিল, সেই ক্রিকেটের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবেন না বলে সরে গেছেন ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার কপিলদেব নিখাঞ্জ। গাভাসকার যদি কখনো ভারতীয় দলের কোচ হতেন তাহলে তাঁর কপালেও অমন দুর্দশা ঘটতো। তাই তিনি হাজার অনুরোধেও ঐ রকম কোনো দায়িত্ব নিতে রাজী হননি। কপিলের আগে যে সব প্রাক্তন খেলোয়াড় ভারতীয় দলের কোচ হয়েছিলেন তাঁদেরও ঐ ভাবে গলাধাক্কা খেতে হয়েছিল। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মধ্যে শিরোনামে ফিরে আসার ইচ্ছে সব সময়ই থাকে। কোচ হবার প্রস্তাব দিলে তাই তাঁরা না ভেবেই লুফে নেন। গাভাসকার তো সেইরকম মানুষ নন। তিনি অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে চলেন। তাই তিনি কোনোদিন ঐ সব প্রস্তাবে রাজী হননি। এমনকি নির্বাচকমণ্ডলীতেও যেতে চাননি। আসলে সব বিতর্ক থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কপিলও যদি তাই করতেন তাহলে তাঁকে আজ এইভাবে অসম্মান, অশ্রদ্ধা ও বদনামের বোঝা কাঁধে নিয়ে ক্রিকেট জগৎ থেকে নির্বাসন নিতে হতো না।

ক্রিকেট বোর্ড সব সময় ইয়েসম্যান খোঁজে। কপিলদেব, গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদীরা কোনোদিনই তা নন। তাঁরা সব সময় খেলোয়াড়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক সুবিধের কথা ভাবেন। সেইসব দাবি আদায়ের জন্য বোর্ডের ওপর চাপ দেন। বোর্ডের তা পছন্দ নয়। সুতরাং...। কপিলদেব কোচ হবার প্রথম দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় বোর্ড সচিব জয়ন্ত লেলের। তারপর মনোজ প্রভাকরের বোমা ভারতীয় ক্রিকেটের ভিত নড়িয়ে

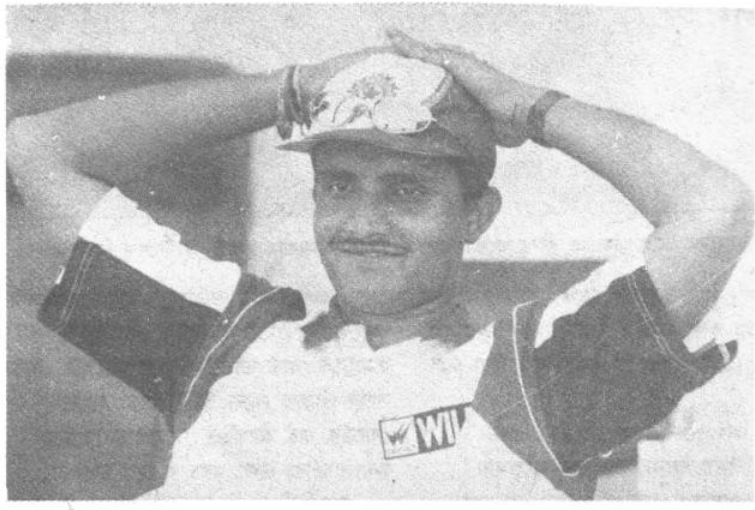

দিয়েছে। সে বোমা সত্যি না মিথ্যে তা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোনোদিন যাবে বলে মনেও হয় না মধ্যে পড়ে ভারতীয় ক্রিকেটের মান-সম্মান ধুলোয় মিশে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাঙ্গনে। যারা সত্যি সত্যিই ক্রিকেট বেটিং-এর সঙ্গে জড়িত তারাই এখন আঙুল তুলছে ভারত ও

কর্ণম মালেশ্বরী—প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে ওলিম্পিকের পদক পেয়েছেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের দিকে।

এইরকম একটা বিশ্রী সময়ে সৌরভ গাঙ্গুলি হয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। দলের নির্ভরযোগ্য দু'জন খেলোয়াড় প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজাহারউদ্দিন আর সহ-অধিনায়ক অজয় জাদেজাকে তিনি পাশে পাবেন না। তাঁরা বাদ পড়েছেন ম্যাচ ফিক্সিং-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও। ফলে ভারতীয় দলে এখন অনেক নতুন মুখ।

ভারত ইদানীং পাকিস্তানের সঙ্গে খেলছে না। কারণ পাকিস্তান ক্রমাগত উগ্রপন্থীদের পাঠিয়ে আমাদের দেশের নিরীহ মানুষদের মারছে। কাশ্মীর সীমান্তে হামলা করছে। এই অবস্থায় তাদের সঙ্গে না খেলাই উচিত। সে যাই হোক, সৌরভ নিজের দলটাকে 'সেট' করে নেওয়ার সুযোগই পাচ্ছেন না। কোচ কপিলদেবের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পর্ক ছিল দাদা-ভাইয়ের। কপিলও ছোট ভাইয়ের মতো খেলোয়াড়দের আগলাতেন। একথা ঠিক কপিল কোচ হিসাবে তেমন কিছুই করতে পারেননি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কোচ হবার দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে লেলের বিতর্ক। তারপর মনোজ প্রভাকরের

সৌরভ গাঙ্গুলির প্রধান কাজ ভারতকে আবার জয়ের পথে ফিরিয়ে আনা।

ইস্টবেঙ্গলের আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ের হিরো গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখার্জী ও দীপেন্দু বিশ্বাস।

হিংসা-বোমা ইত্যাদি তাঁকে কোনোদিনই ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে দেয়নি। এর জন্য আর যাই হোক, কপিলকে কিন্তু দায়ী করা চলে না।

কপিলদেব সরে গেছেন। এখন কিছুদিনের জন্যে এসেছেন অংশুমান গায়কোয়াড়। পাকাপাকিভাবে কে কোচ হবেন তার কোনো স্থিরতা নেই। বোর্ডের নজর বিদেশী কোচের দিকে। তাঁরা আর যাই হোক খেলোয়াড়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা অন্য কোনো দাবি আদায়ের জন্যে চাপ সৃষ্টি করবেন না। যাঁদের জন্যে ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড ভারতের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংস্থা তাঁদের জন্যে টাকা খরচ করতে বোর্ডের যত আপত্তি। খেলোয়াড় তৈরির জন্যও তাঁরা টাকা খরচ করতে চান না।

সব মিলিয়ে ক্রিকেট জগতে এখন একটা ডামাডোল চলছে। কথায় বলে, টু মাচ অফ এনিথিং ইজ ব্যাড। ক্রিকেটের হয়েছে ঠিক তাই। এত খেলা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের কাছে ক্রিকেটের আকর্ষণ হারিয়ে যাচ্ছে। টেস্ট ক্রিকেট আগেই হারিয়েছিল, এখন একদিনের ক্রিকেটও ধীরে ধীরে একঘেয়ে হয়ে পড়ছে। যত বেশি খেলা হচ্ছে, স্পনসররা টাকার থলি নিয়ে ততই এগিয়ে আসছে, ক্রিকেট বোর্ড আরও ধনী হচ্ছে, খেলোয়াড়রা ভাগ পাচ্ছেন—ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু ক্রিকেটেরই। অথচ সে দিকে নজর দেবার তাগিদ কেউই অনুভব করছেন না। যখন করবেন তখন কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাবে।

আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কিনা। বিশ্বকাপ জিতে এনে কপিলদেব ভারতীয় ক্রিকেটকে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেখান থেকে অনেকদিন আগেই সরে আসতে হয়েছে। সৌরভ কি পারবেন ভারতকে আবার সেখানে টেনে তুলতে? ভারতীয় দলে এখন ভাঙাগড়া চলছে। পুরোনো খেলোয়াড়রা একে একে সরে যাবেন। আসবেন নতুনরা। তাঁরা আসতে আরম্ভ করেওছেন। দেখা যাক এবার ভারতীয় দলের চেহারা কী দাঁড়ায়।

শুধু ওলিম্পিক সাঁতারু নন, তিনি টারজান

ছেলেটির বয়স মাত্র ২০। প্যারিসে ওলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসেছে। কুড়ি বছরের জনি আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্যারিসে। গরিব ঘরের ছেলে জনি। বাবা ছিলেন একজন সামান্য খনি-মজুর। তবে সাঁতারটা জনি ভালোই জানে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে সে সাঁতার-জগতে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তাই সে এবার আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্যারিস ওলিম্পিকে যোগ দিতে এসেছে।

প্যারিসে সে চার-চারটি স্বর্ণপদক জিতল। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ৪×১০০ মিটার রিলে, ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল আর ওয়াটার পোলোতেও সে সোনা জিতল। চার বছর পরে আমস্টারডাম ওলিম্পিকে যোগ দিয়ে সে পেল ১০০ মিটার ও ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সোনা।

এলো ১৯৩২ সাল। জনি তৈরি হচ্ছে

ওলিম্পিকের জন্যে। সে তখন আমেরিকার সব থেকে জনপ্রিয় সাঁতারু। একটি রেডিমেড পোশাক তৈরির কোম্পানি তার জনপ্রিয়তা কাজে লাগাতে চাইল। তাদের কাছ থেকে প্রস্তাব এলো জনি যদি তার সাঁতারের পোশাক পরা ছবি সেই কোম্পানির বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে দেয় তাহলে সে সপ্তাহে ৫০০ ডলার করে পাবে।

জনি রাজী হয়ে গেল। কাগজে কাগজে ছাপা হতে লাগল সাঁতারের পোশাক পরা ছবি। সেই সঙ্গে ক্যাপশান—জনি এই কোম্পানির অন্তর্বাস ব্যবহার করে। আপনারাও করুন। কোম্পানিটির বিক্রি হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল।

ওদিকে কাগজে জনির ছবি দেখে হলিউডের টনক নড়েছে। এইরকম চেহারার একজনকেই তো তারা এতদিন খুঁজছিল। দারুণ মানাবে একে। সময় নষ্ট না করে ফিল্ম কোম্পানির লোক এসে হাজির হলো জনির কাছে। ভণিতা না করে তারা সোজাসুজি বলল, আমরা তোমার মতোই একজনকে খুঁজেছি। অভিনয় করবে?

সিনেমা?

হ্যাঁ। অ্যাডভেঞ্চার ছবি। আমেরিকার...

টারজান? জনি জিজ্ঞেস করে।

টারজানের গল্প তার দারুণ লাগে।

হ্যাঁ, রাজী হলে তুমিই হবে আমাদের হিরো—টারজান।

আমি টারজান হবো? জলে-জঙ্গলে

দাপিয়ে বেড়াবো। হাতির পিঠে বসে ঘুরবো। সিংহর সঙ্গে লড়বো। জনি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বলল, আমি রাজী।— টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করবো।

সেই শুরু। ওলিম্পিকের সফল সাঁতারু জনি ওয়েসমুলার হয়ে গেলেন সিনেমার হিরো। জঙ্গলের বিস্ময় টারজান। শুরু হলো 'টারজান দি এপম্যান' ছবির কাজ।

ছবিটি রিলিজ হয়ে যাবার পর সাঁতারু জনি ওয়েসমুলারের কথা সকলে ভুলে যেতে লাগল। জনি হয়ে গেল টারজান। আফ্রিকার জঙ্গলের রাজা টারজান। দীর্ঘ ১৬ বছরে তিনি ১১টি সিনেমায় টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। টারজান হিসেবে তিনি গোটা বিশ্বে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে লোকে তাঁর জনি ওয়েসমুলার নামটাই ভুলে যেতো।

১৯৮৪ সালে ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু টারজান হিসেবে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আজও সারা পৃথিবীতে তাঁর ছবিগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হয়। ওলিম্পিক এলেই তাই সকলের মনে পড়ে যায় জনি ওয়েসমুলারের কথা। ওলিম্পিকের স্মরণীয় চরিত্রগুলির মধ্যে তিনিও যে একজন। ওলিম্পিকের সফল সাঁতারু, চলচ্চিত্রের টারজানবেশী জনি ওয়েসমুলারকে আমরা ভুলছি না, ভুলবো না।

সিডনিতে লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি।

কিং কার্লের দুঃখ

ওলিম্পিক ক্রীড়ার কথা উঠলে সকলের যেমন জে. সি. ওয়েন্সের নাম মনে আসে তেমনি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে কার্ল লুইসের মুখ। একই ওলিম্পিকের অ্যাথলেটিকসের আসরে চার চারটি সোনা জিতে ১৯৩৬ সালে জে. সি. ওয়েন্স যে ঐতিহাসিক নজির গড়েছিলেন কিং কার্ল সেই নজির ছুঁয়ে ফেলেন ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকে। ওয়েন্স চারটি সোনা জিতেছিলেন ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, লংজাম্প ও ৪×১০০ মিটার রিলেতে। কার্লও ঠিক তাই করেন এবং সেই সময় থেকেই লুইস হয়ে যান কিং কার্ল।

কার্ল লুইসের জন্ম ১৯৬১ সালে। ১৯৭৬ সালে ৯·৩ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে সকলকে চমকে দিয়ে তিনি তাঁর অ্যাথলিট-জীবন শুরু করেন। কিন্তু ১৯৮০ সালে মস্কো ওলিম্পিকে তাক লাগানো পারফরমেন্স করার সুযোগ তিনি হারান রাজনৈতিক কারণে। সেবার মার্কিন গ্রুপ মস্কো ওলিম্পিক বয়কট করেছিল। ফলে লুইসের জীবন থেকে একটি ওলিম্পিক হারিয়ে যায়। চার বছর পরে ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে তিনি শিরোনামে এসে যান জে. সি. ওয়েন্সের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলে। ১৯৮৮ সালে কার্ল লংজাম্পে সোনা জেতেন। কিন্তু ১০০ মিটার দৌড়ে কানাডার বেন জনসনের কাছে হেরে যান। কিন্তু জনসন ড্রাগ টেস্টে ধরা পড়ে সোনা হারান। সে পদক ওঠে কার্লের গলায়। ২০০ মিটার দৌড়ে অবশ্য তাঁকে রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৯২ সালে বার্সিলোনা ওলিম্পিকে কার্ল আবার লংজাম্পের সোনা জেতেন। পরপর তিনটি ওলিম্পিকেই কার্ল লুইস লংজাম্পের সোনা জেতার কৃতিত্ব অর্জন করেন। পরের অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে আটলান্টা ওলিম্পিকেও কার্ল লংজাম্পের সোনা জিতে নেন।

একটি দুটি নয় ওলিম্পিক ক্রীড়ায় মোট ৯টি সোনার পদক জিতেছেন কার্ল। মোট ১৬ বছর ধরে তিনি ওলিম্পিকের সোনা জিতেছেন। এ এক স্মরণীয় কৃতিত্ব। ওলিম্পিকের আসর থেকে তিনি ৯টি সোনার পদক জিতে এনেছেন। ৯টি সোনা জেতার রেকর্ড আছে ফিনল্যান্ডের দূরপাল্লার দৌড়বীর পারভো নুরীম-র আর রাশিয়ার

জিমনাস্ট লারিয়া লেটনিনা-র।

পর পর চারটি ওলিম্পিকে লংজাম্পের সোনা জিতলেও কার্ল লুইসের মনে একটা চাপা দুঃখ চিরকালের মতো থেকেই যাচ্ছে। কার্লের দুঃখ উনি বব বিমোনের ৮·৯০ মিটারের নজির ছুঁতে বা ডিঙোতে পারেননি। এই দুঃখ ওঁর মন থেকে কোনোদিনই যাবে না। জে. সি. ওয়েন্স-এর মতো ৯টি সোনার পদক জিতলেও কার্ল লুইস কোনোদিনই বব বিমোনের রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। এইটাই তাঁর একমাত্র দুঃখ। বিমোন লংজাম্পে লাফিয়েছিলেন ৮·৯০ মিটার।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ

১। কোন মহিলা অ্যাথলিট প্রথম ভারতের পক্ষে ওলিম্পিকে অংশ নেন?

২। সিওল ওলিম্পিকে এক পরিবারের দু'জন—ননদ আর বৌদি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তাঁদের নাম কি?

৩। ভারতের পক্ষে ওলিম্পিকের অ্যাথলেটিকস বিভাগে কে প্রথম পদক জেতেন? তাঁর নাম কি, কোন সালে এবং কোন কোন বিভাগে তিনি পদক পান?

৪। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ভারত দুটি পদক জিতেছিল। একটি সোনা অন্যটি ব্রোঞ্জ। সোনা এসেছিল হকিতে। ব্রোঞ্জটি কোন বিভাগে?

উত্তর ঃ

১। মেরি ডিসুজা। ১৯৫২ সালে।

২। ননদ—জ্যাকি জয়নার কার্সি দুটি সোনা জিতেছিলেন সিওলে। তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বৌদি—ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার। তিনি জিতেছিলেন তিনটি সোনা।

৩। ১৯০০ সালে প্যারিস ওলিম্পিকে কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে নর্মান প্রিচার্ড নিজের খরচে যোগ দিয়ে ২০০ মিটার দৌড় ও ২০০ মিটার হার্ডলসে রুপোর পদক জিতেছিলেন।

৪। কুস্তি।

উক্তি

পুরোপুরি পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমি এবং আমার পরিবার দুঃখ, কষ্ট ও অসম্মান সহ্য করেছি যাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ করছি না। শুধু বলছি, যে ক্রিকেট আমার, যে ক্রিকেট আমার রক্তে তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না।

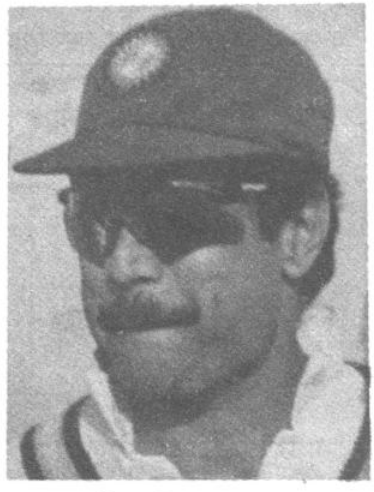

কপিলদেব

(ভারতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর)

গোটা বিশ্বে ক্রিকেট নিয়ে যে জঘন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার সাম্প্রতিকতম শিকার ভারতের কিংবদন্তী ক্রিকেটার কপিলদেব। ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।

রিচি বেনো

(সম্প্রতি একটি লেখায় কপিলদেবের পদত্যাগ প্রসঙ্গে।)

কপিলদেবের জন্যে আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে গেছে। আমি ওর ছোটবেলার বন্ধু। এখন না হয় আমাদের সম্পর্ক তিক্ত। তবু আমি জোর দিয়ে বলছি, কপিল দেশের সঙ্গে গদ্দারি করতে পারে না। কেউ গঙ্গাজল ছুঁয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

যোগরাজ সিং

(এক সাক্ষাৎকারে কপিলদেবের সম্পর্কে বলতে গিয়ে)

এক নজরে

এই শেষবার

সিডনিতে শেষবারের মতো ওলিম্পিকে ফুটবল খেলল ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি ওলিম্পিকে খেলতে চায় না। ওখানকার ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি নিকোলাস লিওজ বলেছেন, ওলিম্পিকে খেললে কোনো পয়সা পাওয়া যায় না। খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই পেশাদার তা ছাড়া দলের প্রস্তুতিপর্বে বিস্তর খরচও হয়। পেশাদার খেলোয়াড়দের তো বারবার বিনা পয়সায় খেলতে বলা যায় না। তাই ঠিক হয়েছে, সিডনি ওলিম্পিকই শেষ। এরপর ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি আর ওলিম্পিক ফুটবলে খেলতে যাবে না। এ এক অভিনব সিদ্ধান্ত। ল্যাটিন আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মনে হয় ঝড় উঠবে। দেখা যাক তাতে কী হয়।

গোলের বদলে

ব্যাপারটা অনেকটা সেই 'নাকের বদলে নরুণ পেলাম' গোছের হয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছে হারারেতে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায়। খেলাটি দেখতে মাঠে হাজির হয়েছিলেন ৬০ হাজার দর্শক। এই খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় গোলটি (২-০) দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকরা মাঠে বোতল ছুঁড়তে শুরু করেন। দেশের মাঠে জিম্বাবুয়ের হার দেখতে রাজী ছিলেন না দর্শকরা। তাঁদের ছোঁড়া বোতলের আঘাতে আহত হন দক্ষিণ আফ্রিকার গোলদাতা ডেলরন বাকলি। তারপরই অবস্থা সামাল দিতে আসরে নেমে পড়ে পুলিশ। স্টেডিয়ামের দিকে তাক করে তারা কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। দর্শকরা ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করেন। স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পাগলের মতো হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। সেই ধাক্কাধাক্কিতে এবং ভীত দর্শকদের পায়ের চাপে ১৩ জন দর্শক প্রাণ হারান। আহতের সংখ্যা অনেক।

ওলিম্পিকে মেয়ে

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

সারা গ্রীস দেশটা জুড়ে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। গ্রীসবাসীদের আনন্দ ধরে না। এতদিন ধরে প্রতীক্ষার শেষে তাদের স্বপ্নের ওলিম্পিক গেম্‌স সামনে এসে গেছে। এখন আর কেউ কারও শত্রু নয়। সবাই সবার বন্ধু। আসন্ন উৎসবের আনন্দের কথা ভেবে সবাই খুশিতে উজ্জ্বল।

প্রতিযোগীদের চোখে ঘুম নেই। ঘুমোলেও দৌড়বীর রাতে স্বপ্ন দেখে, সে দৌড়াচ্ছে। কোনো রাতে জয়ের, কোনো রাতে বা পরাজয়ের স্বপ্ন। যে কুস্তি লড়বে, সে স্বপ্ন দেখে কুস্তি লড়াইয়ের। এক কথায়, যে যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, সেই খেলারই স্বপ্ন জুড়ে থাকে তার চিন্তায়, দেহে, মনে।

আগামী উৎসবের এমন এক আনন্দমুখর দিনে গ্রীসে সংবাদ এল, অত্যাচারী পারস্যসম্রাট গ্রীস আক্রমণ করবে।

এক ফুৎকারে নিভে গেল সারা দেশে জ্বলে ওঠা আনন্দের দীপ। যুদ্ধ মানে তো প্রাণহানি। যুদ্ধ মানে তো অশান্তি। অশান্তির মধ্যে উৎসবের ঠাঁই কোথায়।

গ্রীসের রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, আসুন, আমরা অলিভের পাতা নিয়ে পারস্যসম্রাটের কাছে আপাতত শান্তি চাই।

মন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজামশাই সম্মত হলেন। উনি মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রমুখ গণ্যমান্যদের সঙ্গে অলিভের পাতা নিয়ে হাজির হলেন পারস্যসম্রাটের কাছে।

অলিভের পাতা গ্রীসবাসীদের কাছে শান্তির প্রতীক। পারস্যরাজ গ্রীকরাজের শান্তি প্রস্তাবে সাড়া দিল। বলল, বেশ, ওলিম্পিক গেম্‌স সেরে নিন। যুদ্ধটা না হয় তারপরেই হবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সকলে। যাক, তাদের ওলিম্পিক গেম্‌স তা হলে নির্বিঘ্নেই হবে।

ডেইক্লেস, গ্রীসের একজন বিখ্যাত দৌড়বীর। সে যে পরিবারের সন্তান, সে পরিবার সপ্তম ওলিম্পিক থেকে চুয়াত্তরতম ওলিম্পিক পর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান লাভ করে আসছে। যুদ্ধ না বাধার খবরে আর সব প্রতিযোগীরা যখন জোরকদমে খেলাধুলোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে, ডেইক্লেস তখন কেঁদে মাটি ভেজাচ্ছে।

এখন হয়েছে কি, ডেইক্লেস গিয়েছিল তার বাগানে গাছ কাটতে। কপালদোষে একটি গাছ পড়ল তার পায়ে। ফলে যা হবার তা-ই হলো। দৌড়বীর ডেইক্লেসের পা গেল থেঁতলে।

ডেইক্লেসের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা দীমেনেতা। পুত্রসন্তান থাকলে ডেইক্লেস অত ভাবত না। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তাকেই তার বদলে পাঠিয়ে দিত। এই জখম পা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামা যেতে পারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর সম্মান পাওয়া অসম্ভব। ডেইক্লেস হতাশায় ভেঙে পড়ল। তার পরিবারের বিজয়ীর সম্মান হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে। অথচ এমন ঘটনা এই পরিবারেই ঘটেছে যখন একই সঙ্গে পিতা-পুত্র দু'জনেই দৌড়ের পাল্লায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অলিভের মালা পরে বাড়ি ফিরেছে। সে কথা ভেবে ডেইক্লেস হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে।

বাপের কান্না সহ্য হলো না মেয়ে দীমেনেতার। সে বলল, বাবা, দৌড়ে তোমার বদলে আমি নামব। আর দেখো, শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর অলিভ-মালা তোমার বাড়িতেই আসবে।

দীমেনেতার কথায় চমকে উঠল ডেইক্লেস। তারপর আতঙ্কে শিউরে উঠে কাঁপা-কাঁপা গলায় মেয়েকে বলল, তুই কি বলছিস মা! তুই না মেয়ে? তুই কি জানিস না, এদেশের মেয়েরা ওলিম্পিক গেম্‌স-এ যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, চোখের দেখা দেখলেও তাদের চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়?

তা জেনেও আমি দৌড়ের পাল্লায় নামবো।

ডেইক্লেস বলল, তুই বোধহয় জানিস না, মেয়েরা সে অপরাধ করলে রাজার হুকুমে অপরাধিনীকে টাইপেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তার ফল এক ভয়াবহ মৃত্যু।

দীমেনেতা এ কথায় কোনো ভয় না পেয়ে বলে, আমি সব জানি বাবা। আমি সে মৃত্যুকে এক তিল ভয় পাই না। আর মরলেও আমি শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরের সম্মান

আমাদের পরিবারের মধ্যে ধরে রাখবই।

শুরু হলো দীমেনেতার অনুশীলন। তার আগে সে নিজেকে সাজিয়ে নিল পুরুষের পোশাকে। পথচলতি নানা মানুষের চোখের সামনে দিয়ে গ্রীসের পথে সে দৌড় অনুশীলন করে। কেউ তাকে মেয়ে বলে চিনতে পারে না। শুধু তার হরিণের মতো গতি দেখে ভাবে, এবারের ওলিম্পিকে সেরা দৌড়বীরের সম্মান এই যুবকটিই বোধ হয় পাবে।

অবশেষে ওলিম্পিয়া শহরে বসল ওলিম্পিক গেম্‌স-এর আসর। দেশের নানা দিক থেকে প্রতিযোগীরা হাজির হয়েছে। এসেছে ডেইক্লেসও, আঘাত পাওয়া পায়ের অসহ্য যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিযোগিতায় সামিল হতে। মূল প্রতিযোগিতার আগে ছোট-খাটো নানা পরীক্ষা দিতে হলো ডেইক্লেসকে। অবশেষে দেবতা জীউইসের সামনে শপথ নেবার পালা। প্রতিযোগীদের বলতে হবে, আমি একজন খাঁটি গ্রীক। কোনো পাপ আমাকে কোনোদিন স্পর্শ করেনি।

ডেইক্লেস সত্যই নিষ্পাপ। গ্রীক দেবতা জীউইসের কাছে এ শপথ নিতে তার কোনোরকম অসুবিধে হলো না।

দ্বিতীয় শপথ ঃ আমি দেবতার কাছে কোনো দ্বিধা না করে বলছি যে, আমি কোনোরকম ছল-চাতুরি বা শঠতার আশ্রয় খেলার সময় নেব না।

কুণ্ঠা এসে জড়িয়ে ধরল ডেইক্লেসকে। সমস্ত রীতি-নীতি-নিষেধকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আজ তার কন্যা দীমেনেতা পুরুষের ছদ্মবেশে দৌড়াবে। তাই শেষ শপথবাক্যটি উচ্চারণের সময় ডেইক্লেস নীরব থাকল। মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকল দেবতা জীউইসের কাছে।

শুরু হলো দৌড় প্রতিযোগিতা। কুড়িজন দৌড়বীর পর পর দাঁড়িয়ে গেছে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র তাদের পাগুলো গতিময় হয়ে উঠল। ডেইক্লেস তার জখম পা নিয়ে কিছুক্ষণ মাত্র দৌড়ে তার সীমানা থেকে ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারাল।

একটা সোনার থামের আড়ালে দীমেনেতা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সারা মাঠে তখন টান টান উত্তেজনা। সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দীমেনেতা প্রতিযোগীদের ভিড়ে মিশে গেল। হরিণের গতিতে শুরু করল দৌড় আর দৌড়। ব্যস, সবাইকে পিছনে ফেলে সে পৌঁছে গেল মার্বেল পাথরের তৈরি সেই থামটার কাছে, যেখানে পৌঁছালেই প্রতিযোগীকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। দর্শকদের সমবেত করতালির শব্দে সারা মাঠ মুখর হয়ে ওঠে।

প্রথম পুরস্কার প্রাপককে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এলেন বিচারকের দল। উজ্জ্বল পোশাকে সভাপতি দৌড়ে এলেন অলিভ পাতার মালা নিয়ে। দীমেনেতা সবই গ্রহণ করল কিন্তু একটা কুণ্ঠা যেন তার সব আনন্দ ম্লান করে দেয়।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। প্রতিযোগীদের দিকে কড়া নজর রাখার জন্যে ওলিম্পিকের মাঠে থাকতেন কিছু বিচক্ষণ মানুষ। দর্শকদের দিকেও তাঁরা কড়া নজর রাখতেন যাতে কোথাও কোনোরকম অশান্তি না বাধে।

তাঁদেরই একজন হঠাৎ এগিয়ে এসে ওলিম্পিক সভাপতিকে বললেন, দৌড় বিভাগে প্রথম হওয়া প্রতিযোগীকে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। দৌড়ের সময় তার শরীরে কঠিন পেশীগুলোর চলাচল তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। এত মসৃণ, এমন সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একজন পুরুষ প্রতিযোগীর হয় কি করে। প্রতিযোগীটিকে একবার পরীক্ষা করা দরকার।

পরীক্ষায় দেখা গেল, সন্দেহটা সত্য। এবারের দৌড় প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী পুরুষ নয়, একটি মেয়ে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। সবাই একবাক্যে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, এ কি সর্বনাশ! কে এই দুঃসাহসী মেয়ে যে ওলিম্পিকের এতদিনের নিষেধের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে এত বড় একটা অন্যায় করল!

বিচারকদের সভা বসল। বাইরে জনতার চিৎকার, ওই সর্বনেশে মেয়েটাকে দাও টাইপেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে।

বিচারকের দল দীমেনেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, তোমার এই কাজের পরিণাম কি?

একটুও ভয় না পেয়ে মেয়েটি হাসি-মুখে বলল, জানি, ভয়ঙ্কর মৃত্যু।

তুমি মৃত্যুর কথা বলতে গিয়েও হাসার সাহস পেলে কোথা থেকে?

দীমেনেতা বলল, মহামান্য বিচারকগণ, আপনারা সকলেই জানেন, সপ্তম ওলিম্পিক থেকে চুয়াত্তরতম ওলিম্পিক পর্যন্ত আমাদের পরিবারের কেউ না কেউ প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরের সম্মান লাভ করেছে। আমার পিতা ডেইক্লেসের পা জখম হয়ে না গেলে তিনি শেষ পর্যন্ত দৌড়াতেন। আর একথাও ঠিক যে, সে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরের সম্মান অন্য কোনো প্রতিযোগীকে ছিনিয়ে নিতে দিতেন না। আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমার পিতার কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাই আমি সেই শূন্যস্থান পূরণ করে আমাদের পরিবারের বরাবরের সম্মান বজায় রেখেছি।

বিচারকরা বললেন, তা রেখেছ কিন্তু তুমি কত বড় নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করেছ, তা কি তুমি জান না?

জানি। মৃত্যু যখন আমার নিশ্চিত, তখন আমার যা বলার তা আমি বলে যেতে চাই। মহামান্য বিচারকগণ, আমি আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এটুকু অন্তত প্রমাণ করে যেতে পারলাম, ওলিম্পিক গেমস্‌-এ শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরাও সুযোগ পেলে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারে। আর সেই যোগ্যতার মাপকাঠিতে মেয়েরা যে পুরুষদের থেকে কোনো অংশে খাটো নয়, সে দৃষ্টান্তও আমি রেখে যেতে পারলাম। এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় পুরস্কার। আপনারা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন। আমি হাসতে হাসতে মাথা পেতে সে দণ্ড গ্রহণ করব।

দীমেনেতার ঝড়ের গতিতে বলে যাওয়া কথাগুলো শুনে বিচারকরা অভিভূত হলেন। তাঁরা বিচার করে দেখলেন, দীমেনেতার যুক্তি অকাট্য। সত্যিই তো, তাঁরা ওলিম্পিকের খেলাধূলায় মেয়েদের সুযোগ না দিয়ে দেশের একটা বিরাট শক্তিকে জাগতে দেননি। তাঁরা দীমেনেতাকে ক্ষমা করলেন।

এরপর থেকে ওলিম্পিক গেম্‌স-এর দরজা মেয়েদের জন্যে খুলে গেল।

ছবি ঃ উজ্জ্বল ধর

উঠছে যারা

বীরু বসু

সাঁতার জানা থাকলে জলে ডোবার ভয় থাকে না। এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন রিষড়া টেঁকিপাড়ার শম্ভু বাগ। তাই তো ছেলে গোপালকে এনে ভর্তি করে দিয়েছিলেন রিষড়া সুইমিং ক্লাবে। সেটা চুরানব্বই সাল। ক্লাবের কোচ ছিলেন তমাল দাস। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে গোপাল এখন অনেক পরিণত। যথেষ্ট প্রতিভাও রয়েছে ওর মধ্যে। তবে প্রতিভা থাকলেই তো হবে না, চাই নিষ্ঠা ও লেগে থাকার মানসিকতা। গোপালের মধ্যে এই দুটো গুণই পুরো মাত্রায় আছে।

তেরো বছর বয়সে গোপাল রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। ছিয়ানব্বই সালে রাজস্থানের জয়পুরে জাতীয় সাব-জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাফল্য না পেলেও ঐ প্রতিযোগিতা তাকে বড় হবার পথ দেখিয়েছে। এরপর দু'বছর অসুস্থতার জন্য গোপাল তেমন ভাবে নজর কাড়তে পারেনি। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা যাচাই করার সুযোগ এসেছে। সে কারণেই সকালে দু'ঘণ্টা এবং বিকেলে তিন ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কেটে চলেছে। সম্প্রতি রাজ্য মিটে তার বিভাগে একশো মিটার ব্যাক-স্ট্রোকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে গোপাল। ফলাফল যে আশানুরূপ হয়নি তা সে নিজেই জানিয়েছে। তবুও সে আশাবাদী, সাঁতার কাটতে কাটতেই একদিন সাফল্য পাবে। সাব-জুনিয়রে এটাই তার শেষ বছর। আগামী বছর থেকে জুনিয়রে প্রতিনিধিত্ব করবে। জুনিয়রে যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে একজন সাঁতারুর যে গুণ থাকা দরকার

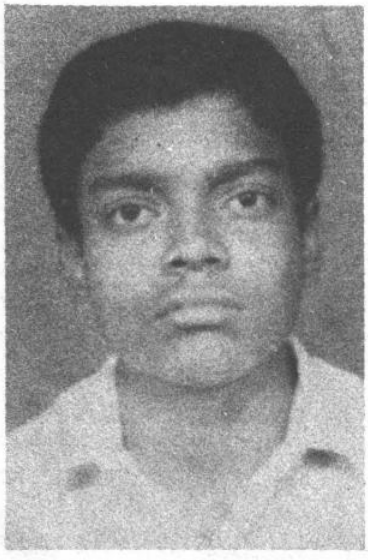

গোপাল বাগ

তার সবটাই গোপাল তার কোচ তমালের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছে। তমালের ধারণা দু'-এক বছরের মধ্যেই গোপাল তার জাত চেনাতে পারবে। অনুশীলন দেখে সেটাই মনে হচ্ছে। গোপাল সাঁতার শিখুক, সাঁতার শিখে বড় হোক এটা তার অভিভাবকরা চাইছেন। আর চাইছেন বলেই লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলের সাঁতারের ব্যাপারে নজর দিচ্ছেন।

বাড়ির একমাত্র ছেলে গোপাল, বাবা-মা'র আশীর্বাদটাই তার কাছে সবচেয়ে বড়। সে কারণেই বাবা-মা যা বলেন মন দিয়ে শোনে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সামান্য সময় খরচ করলেও পঠন-পাঠনে দারুণ মনোযোগী। কারণ ও জানে খেলাধুলোয় সাফল্য পেলেও সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে লেখাপড়াটাও দরকার। সে কারণেই নিয়মিত স্কুলে যেতে কখনই ইতস্তত করে না গোপাল। কোন্নগর বয়েজ হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ও। নিজেই জানিয়েছে স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলোর একটা পরিবেশ আছে। প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার পাত্র খেলাধুলো সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগী। ছেলেদের পারফরমেন্সের ওপর নজর রাখেন এবং মাঝে-মধ্যে ক্রীড়া শিক্ষক শশাঙ্ক শঙ্কর বলকে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এখন কথা হলো প্রতিভা বা ইচ্ছা থাকলেই সব সময় বড় হওয়া যায় না। যদি না পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে। বিশেষ করে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে। গোপালের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তাই। সাঁতার শেখার পরে গোপাল যে ধরনের খাওয়া-দাওয়া করে তা একজন সাঁতারুর পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। কিন্তু বাবার সামর্থ্য নেই যে ছেলেকে দু'বেলা পেট ভরে খাবার দিতে পারেন। ওয়েলিংটন জুটমিলের সামান্যতম উপার্জন এখন তাদের সম্বল। ভাবলেও অবাক লাগে ছাতু আর ছোলা খেয়ে একটি ছেলে প্রতিদিন সাঁতার শিখছে। কারণ কোনো ক্লাবেই সাঁতারুদের জন্য আলাদা টিফিনের ব্যবস্থা নেই। তা সত্ত্বেও রিষড়ার সুইমিং ক্লাবের কর্মকর্তাদের বিশ্বাস মোহনবাগান-প্রিয় গোপাল একদিন সাফল্য পাবেই।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

একা একা ব্যায়াম করার একঘেয়েমি কাটাতে আশ্বিন সংখ্যায় যে ব্যায়ামগুলি শিখিয়েছিলাম তা একজন সঙ্গী নিয়ে করতে হয়। তোমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয় সেইভাবে অভ্যাস করেছ এবং করে ভালও লেগেছে আশা করি। এস, এই মাসে ওইরকম আরো দুটি ব্যায়াম শেখাই। সঙ্গী থাকলে নিয়মিত অভ্যাস করার ইচ্ছেটা জোরদার হবে।

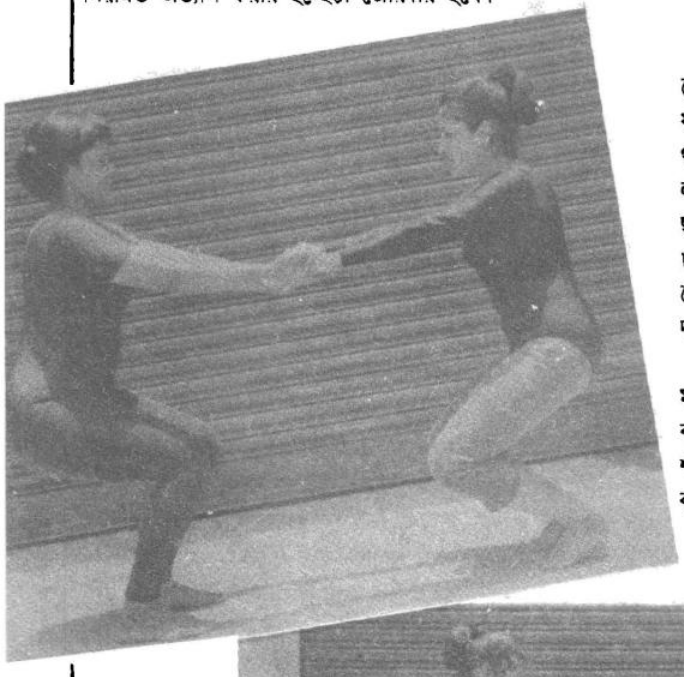

স্কোয়াট বা বৈঠক—দু'পায়ের মাঝে ৮/১০ ইঞ্চি ফাঁক রেখে ছবির ন্যায় দু'হাত ধরে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এখন শ্বাস নিতে নিতে দু'জনেই বস ছবির ভঙ্গিমায়। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে উঠে দাঁড়াও। ১০/১৫ বা সাধ্যমতো বার অভ্যাস কর প্রতি ক্ষেপে। ব্যায়ামটি লম্বা হতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে পায়ের বাত ও অন্যান্য ব্যথায় কষ্ট পেতে হবে না।

সাপোর্ট পুশ আপ—একজন দুটি হাতের পাতা মাটিতে পেতে দাও। অন্যজন তার পা দুটিকে তুলে ধর এমনভাবে যেন যার হাতের পাতা মাটিতে পাতা রয়েছে তার শরীর মাটির সমান্তরাল থাকে। এখন শ্বাস নিতে নিতে কনুই ভাঁজ করে বুক মাটিতে লাগাবার চেষ্টা কর যেমনটি রয়েছে ছবিতে। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কনুই থেকে হাত সোজা করে দাও। এইভাবে ৮/১০ বার অভ্যাস কর। এটি হাতের পিছনের পেশী ও বুকের পেশীর ভালো ব্যায়াম। তাছাড়া ফুসফুসের ব্যায়ামের জন্যেও এটি দরকার।

প্রতিটি ব্যায়ামই দু-তিন ক্ষেপ অভ্যাস করবে। প্রতি ক্ষেপের মাঝে একটু পায়চারি করে ১০/১৫ সেকেন্ড বিশ্রাম নেবে। ব্যায়ামের সময় শরীরের উন্নতির কথা চিন্তা করবে, এতে দ্রুত শরীরের যেমন উন্নতি হবে তেমনই মনোসংযোগ বাড়াতেও সাহায্য করবে। একাগ্রতাই সমস্ত কর্মের সাফল্য।

ছবি : ভাস্কর মুখার্জী

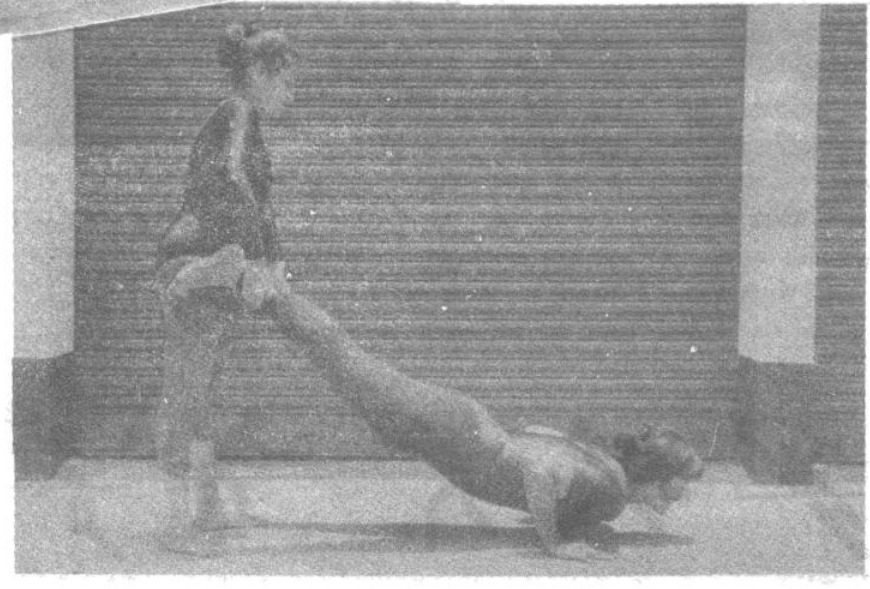

ইন্দুবালা দে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
প্রথম পুরস্কৃত গল্প

শরণাগত

শিবানী নন্দী

সেদিন বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সপ্তম শ্রেণীর শেষ পিরিয়ডে ইতিহাসের শিক্ষক মোহন মহারাজ ক্লাস নিতে এলেন। সারাদিন অসহ্য গরমের পর এই বৃষ্টির ফলে কারোরই আর পড়ায় মন বসছিল না। তাই ছেলেরা মহারাজের কাছে গল্প শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। মহারাজ সস্নেহে বললেন, ঠিক আছে, আজ তোমাদের একটা সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি—

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি এই বিদ্যালয় অর্থাৎ পরমহংস বিদ্যাপীঠের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। এখানকার ছাত্রাবাসেই থাকতাম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছুটিতে আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্র মিলে আমাদের বাংলার শিক্ষক আনন্দ মহারাজের সঙ্গে বেড়াতে গেলাম ঝাড়গ্রামের কাছে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এক পাহাড়ী অঞ্চলে। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় কেরোসিনের আলোয় বসে খাওয়া-দাওয়া আর ভূতের গল্প দারুণ জমল। পূর্ণিমার রাতে চারিদিকের রহস্যমাখা পরিবেশে দূর থেকে ভেসে আসা আদিবাসীদের গান-বাজনার শব্দ শুনতে শুনতে মনে হতো যেন এক অজানা জগতে চলে গেছি। মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বড় ছবি সঙ্গে করে এনে নিজের ঘরে রেখেছিলেন। আমরা সবাই সকাল-সন্ধ্যা সেই ছবির সামনে প্রার্থনা করতাম। মহারাজ ভোর হওয়ার অনেক আগে উঠে স্নান সেরে ধ্যানে বসতেন। ওখানকার চৌকিদার আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল যে, সতর্ক না থাকলে চুরি হতে পারে।

এক দিন রাতে আমরা সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ মহারাজের হাঁক-ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠে এসে দেখি তিনি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন আর চৌকিদার দুটি দেহাতী লোককে চেপে ধরে রেখেছে। আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, ওরা চোর। মহারাজ লোক দুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কি করতে এসেছো? উত্তর না দিয়ে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। চৌকিদার তাদের মারতে উদ্যত হলে মহারাজ তাকে নিরস্ত করে লোক দুটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে চলে যেতে দিলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। দু-তিন দিন পরে গভীর রাতে আবার চার-পাঁচজন লোক চুরি করতে এল। এবার মহারাজ সতর্ক ছিলেন। তিনি তখন বাইরে অন্ধকার উঠোনে পায়চারি করছিলেন। লোকগুলি বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে এসে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনিও তাদের পিছন পিছন এসে ঘরটির দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। লোকগুলির আর পালাবার পথ রইল না। তারা তখন ছুরি, দা নিয়ে মহারাজের দিকে ছুটে এল। তিনি কিন্তু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোনোরকম প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন না। এতে লোকগুলি ভীষণ অবাক হয়ে গেল। তারা তাঁর অগ্নিবর্ষী, অবিচল দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নিচু করে হাতিয়ারগুলি মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে রাখা বাতির শিখাটি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দিব্যভাবময় ছবি দেখে চোর ক'জন স্থির হয়ে গেল। তারপর তারা মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে রাগের পরিবর্তে ফুটে উঠেছে শান্ত, স্নিগ্ধ ভাব। কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেল, তার বোধহয়

হিসাব নেই। হঠাৎ তারা মহারাজের পায়ে লুটিয়ে পড়ে হাহাকার করে উঠল, আমাদিগে মারুন মশায়, আমরা ছোট জাত, চোরের জাত, আমাদিগে আপুনি খুব সাজা দিন।

গোলমাল শুনে চৌকিদার আর আমরা গিয়ে হাজির হলাম মহারাজের ঘরে। আমরা যাবার আগের ঘটনা অবশ্য পরে মহরাজের মুখে শুনেছিলাম। যাই হোক, তারপর দেখলাম, তিনি ধীরে ধীরে লোকগুলিকে তুলে দাঁড় করালেন আর মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে নির্দেশ করে বললেন, ঐ যাঁর ছবি তোমরা দেখছ, উনি ভগবান। ওঁর কাছে ছোট-বড়, চোর-সাধু বলে কিছু নেই, সবাই সমান। তোমরা ওঁকে প্রণাম কর। এইসব খারাপ কাজ আর কোরো না। তখন একটি লোক আকুল কান্নায় বলে উঠল, কিন্তুক, আমরা যে গরীব, মশায়। ভাল করে খেতে পাই না, ছোটো জাত বলে কেউ কাজ দেয় না। তার লেগেই তো এমুন খারাপ কাজ করি। কথাগুলি শোনার পর মহারাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাদের বললেন, আচ্ছা, তোমরা কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। দেখি তোমাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা। এখন তোমরা যাও।

এতদূর গল্প বলার পর স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। মহারাজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেরা বলে উঠল, তারপর কি হলো? মহারাজ হেসে বললেন, তারপর আর কি? এই স্কুলটা তখন নতুন, কাজের লোকেরও দরকার ছিল। তাই আনন্দ মহারাজ ওদের সঙ্গে করে এনে এখানে নানা কাজে লাগিয়ে দিলেন। ছেলেরা সমস্বরে বলে, এই স্কুলে? মোহন মহারাজ বললেন, হ্যাঁ, তোমরা তো তাদের রোজই দেখছ—ঐ যে দারোয়ান পীরালী আর ফুকন, বেয়ারা বাঞ্ছা, রাঁধুনী সুখিয়া, মালী ছোটুলাল—এরাই তো তারা! কথা শেষ করে ছেলেদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে মহারাজ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছেলেরাও বেরিয়ে এল। যেতে যেতে তারা ভাবে—তাই প্রতিদিন তারা যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করে তখন দরজার বাইরে পীরালী, ফুকন, ছোটুলাল, সুখিয়া, বাঞ্ছারাও জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তাদের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে জলের ধারা! মানব-দেহধারী ভগবানের করুণাধারায় সিক্ত হয়ে তারা জীবনে সুস্থভাবে, শান্তিতে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে শরণাগতরা যেমন ধন্য হয়েছে, তেমনই তাদের প্রার্থনাতেও ধন্য হয়েছে বুঝি ভগবানের মহিমা!

ইন্দুবালা দে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

আলোর ঠিকানা

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

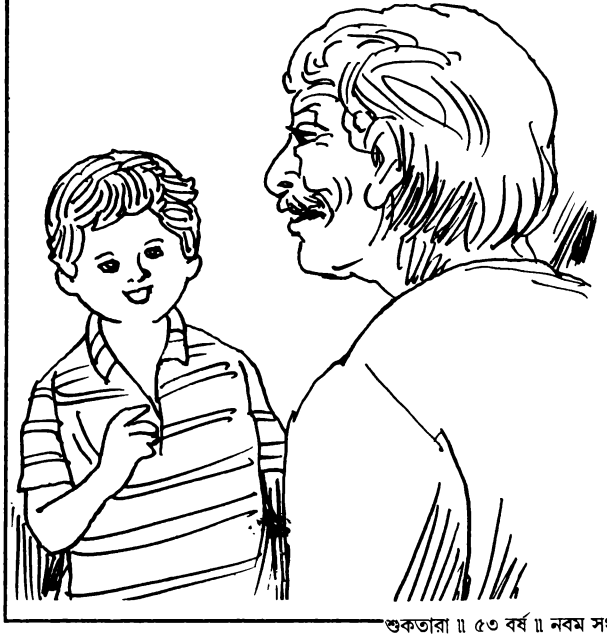

ছোটন ক্লাস নাইনের ছাত্র। কতটুকুই বা বয়েস! কিন্তু এরই মধ্যে সবকিছুই যেন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। অকালে মাকে হারিয়ে সে আজ পাথর! চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই।

ছোটনের বাবা কাছে এসে ওর মাথায় হাত রাখেন। সমবেদনার ছোঁয়া। গুরুতর আঘাতে যা হয়নি, তা ঘটে যায় এক লহমায়। ছোটনের চোখ ফেটে জল আসে। বাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সাগর ও নদ একসঙ্গে উত্তাল হয়। দুঃখের ঢেউ মাখামাখি হতে থাকে।

ছোটনের দাদু সব কিছুই দেখেন। নাতি ও ছেলে, দুজনেই অসহায়। কাকে সামলাবেন তিনি!

বড় গাছে বড় ঝড়। তাই আঘাত তিনিও কম পাননি। ছোটন তাঁর হাতের লাঠির মতো। বল, শক্তি, সব কিছুই। ছোটন মুষড়ে পড়লে, তাঁকে দেখবে কে? সতেজ শাখা-প্রশাখাই তো গাছের মূলধন!

রাত্তিরে ছোটন তার দাদুর কাছেই শোয়। আগে গল্প শুনতো, এখন কিছুই ভাল লাগে না।

ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। পুব আকাশে আবিরের রঙ। আলোর ঝর্ণাধারায় সূর্যটা ভাসছে! বৃদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন, "জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।" এ যেন সূর্যবন্দনা। আলোর দিশারীর আবাহন।

ছোটনের ঘুম ভাঙে। দাদুর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে। দাদু যেন আজ অন্য জগতের মানুষ। মুখে প্রশান্ত হাসি, এত ব্যথা-যন্ত্রণা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

ছোটনকে দেখে হো হো করে হেসে ওঠেন তিনি। বলেন, দুর বোকা! দুঃখকে এত গায়ে মাখিস তুই! দুঃখ আর সুখ তো পাশাপাশি দাদুভাই! অন্ধকার রাত্রি মানেই তো দুঃখ! দেখছিস না, সূর্যের আলোয় সেটা কেমন খান খান হয়ে গেছে! তাই, দুঃখ চিরকাল থাকে না রে! শীতের পর বসন্ত যেমন আসে, তেমনি দুঃখের পর সুখও ঠিক এসে হাজির হয়। ঐ দেখছিস না, আঁধার কাটিয়ে সূর্য কেমন হাসছে! ওর মতো তুই, আমি, তোর বাবা—সবাই যদি হাসতে পারি তাহলে দুঃখ ব্যাটা তো পালাই পালাই করতে বাধ্য!

দাদুর কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে ছোটন। ঐ হাসিটুকুতে যেন কৃতার্থ হন বৃদ্ধ। তাঁর মুখে আবার কথা যোগায়। হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, আগুন যেমন আছে জলও তেমনি আছে। নইলে দেশটা যে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো ভাই! ভগবান কিন্তু ভীষণ সমঝদার লোক। আঁধার যেমন দিয়েছেন, তেমনি তা কাটাতে, চাঁদ-সূর্যকেও হাজির করে ছেড়েছেন। আগুন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জলের যোগান দেওয়াটাও তো তাঁর এক বিরাট কীর্তি!

ছোটন বলে, আচ্ছা দাদু, ভগবান বুঝি খুব ভাল?

ভীষণ ভাল রে দাদু! তাঁর করুণাধারা নিরন্তর বইছে বলেই না বাঁচোয়া!

ছোটনের এত তত্ত্ব বোঝার কথা নয়। তবু সে অদ্ভুত এক সান্ত্বনা পায়। কোন এক অদৃশ্য করুণায় সে আপ্লুত হয়। দুঃখের আঁধার কাটিয়ে, সে যেন নেমে আসে অনাবিল এক আলোর ঐশ্বর্যে!

ছবিঃ সুফি

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছেঃ

সেখ আলাউদ্দিন হোসেন (উপরবান্দা, বাঁকুড়া)।। মহঃ আজফারুল হক (কান্দী, মুর্শিদাবাদ)।। তরশুরাম (কেশপুর, মেদিনীপুর)।। বিশ্বনাথ ঢ্যাং (বল্লভপুর, মেদিনীপুর)।। পাঁচুগোপাল মণ্ডল (পার্বতীপুর, দঃ ২৪ পরগনা)।। মালা মুখার্জী (লেকটাউন, কলি-৮৯)।। অন্তরা রায় (আসানসোল, বর্ধমান)।। গৌতম বিশ্বাস (রাজারমাঠ, নদীয়া)।। সন্দীপ সরকার (টেগোর প্লেস, দুর্গাপুর)।। তপন রায় (খড়দা, উঃ ২৪ পরগনা)।।

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপকরাঃ শিবানী নন্দী, সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখ আলাউদ্দিন হোসেন, মহঃ আজফারুল হক ও তরশুরাম।

ঘোষণা

কলকাতার তেঘরিয়া নিবাসী তপন কুমার সেন তাঁর স্বর্গত পিতা শচীন্দ্রলাল সেনের স্মৃতি রক্ষার জন্যে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাবমতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে শচীন্দ্রলাল সেন স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

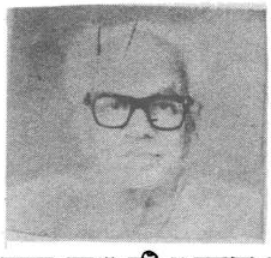

৺শচীন্দ্রলাল সেন
জন্ম: ১৯২০
মৃত্যু: ১ মে ২০০০

বিষয়বস্তু
সততা

*পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারা **ফাল্গুন** সংখ্যায় ছাপা হবে। লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ **কার্ত্তিক**।*

প্রথম পুরস্কারঃ ১০০ টাকা □ দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ৫০ টাকা

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

সার্ভেয়র না টুলমেকার ?

তোমাদের জন্যে এবার দুটি ভালো কোর্সের সন্ধান দিচ্ছি। কোর্স দুটি হলো—(১) ইন্সট্রুমেন্ট টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স; (২) সার্ভে এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স। এসব কোর্স করে বসে থাকতে হবে না, রুজির একটা ব্যবস্থা হবেই।

টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং কোর্স করে ভবিষ্যতে ডাইমেকার কিংবা ইন্সট্রুমেন্ট টেকনোলজিস্ট হওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের দুটি প্রতিষ্ঠানে এই কোর্স পড়ানো হয়—বনহুগলির সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং শিবপুর পলিটেকনিকে। বনহুগলির প্রশিক্ষণ শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে। চার বছরের কোর্স। মনোনীত সব প্রার্থীই স্টাইপেন্ড পেয়ে থাকে। হস্টেলের সুযোগ আছে!

অঙ্ক, বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে যেসব প্রার্থী মাধ্যমিকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে তারা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। বয়স হতে হবে ১৮ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রার্থীরা বয়সের ক্ষেত্রে তিন বছরের ছাড় পাবে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হলো কলকাতা, পাটনা, ভুবনেশ্বর এবং গুয়াহাটি।

মে-জুন মাস নাগাদ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। যোগাযোগ করা যেতে পারে—জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, বনহুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩৫। শিবপুর পলিটেকনিকেও টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং কোর্স পড়ানো হয়। এটি ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স। সেশন শুরু আগস্ট মাস নাগাদ। মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। যোগাযোগ—শিবপুর পলিটেকনিক, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস, বোটানিকাল গার্ডেন, হাওড়া-৩। যন্ত্রপাতি ও ছাঁচ তৈরির কোর্স পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত বিভিন্ন মেকানিক্যাল ফার্মে বা কারখানায় ইন্সট্রুমেন্ট টেকনোলজিস্ট, ডাইমেকার, টুলমেকার ইত্যাদি পদে নিযুক্তির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া বেসরকারি এঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, ছাঁচ তৈরির বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। যন্ত্রপাতি কিনে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এসব সংস্থা চালানো সম্ভব।

এবার আসি, সার্ভে এঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজের কথায়। কনস্ট্রাকশনের যে কোনো ধরনের কাজেই নকশা প্রয়োজন। এই নকশা-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে চাকরির জন্য অপেক্ষা না করেও ভালো আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে, পুরসভা, আধা-সরকারি সংস্থায় সার্ভেয়র পদে প্রচুর লোক প্রয়োজন হয়। জমির মাপজোখ, দালান বাড়ির নকশা তৈরির কাজে আমরা হামেশাই প্ল্যানারের কাছে ছুটি। চাকরির অপেক্ষা না করেও এইসব কাজ জানা লোক নিজেই চেম্বার খুলে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে।

ব্যান্ডেলে এজন্য রয়েছে সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট। তিন বছরের কোর্স। বয়স থাকতে হবে ২১ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের ছাড় আছে। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। দরখাস্ত করতে হয়—প্রিন্সিপাল, ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট, ব্যান্ডেল, হুগলি ঠিকানায়।

এবার পাঠক বন্ধুদের চিঠিপত্রের উত্তরে আসা যাক। চন্দননগর থেকে সুমন পাত্র জানতে চেয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারম্যানশিপ পড়ার দু'একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা। যেমন—সিটি টেলিগ্রাফ কমার্শিয়াল কলেজ (কলকাতা), ক্যালকাটা ইয়ুথ সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট সেন্টার (বেহালা), ইত্যাদি।

ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষণ নিতে হলে কোথায় চিঠি লিখতে হবে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বারুইপুরের রমেন নস্কর। তোমার চিঠির উত্তরে জানাই, এই কলেজের ভর্তির বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফৎ জানানো হয়। এক্ষেত্রে নাগপুরের ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ উল্লেখযোগ্য। ঠিকানা—ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ, নাগপুর-৪৪০ ০০১। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের ফায়ার সার্ভিস ডাইরেক্টরেট ফায়ার অপারেটর ট্রেনিং দেয় সেন্ট্রাল ফায়ার সার্ভির অ্যান্ড রেসকিউ ট্রেনিং স্কুলে। ওদের ঠিকানা হলো—১২৯ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৪৭। এক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার—ক্লাস এইট পাস। উচ্চতা কমপক্ষে পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি, বুকের ছাতি ৩২ ইঞ্চি (ফুলিয়ে ৩৪ ইঞ্চি)। দু'বছরের প্রশিক্ষণ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলের ঠিকানা জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে রণবীর চৌধুরী, ডায়মন্ডহারবার থেকে। তোমার চিঠির উত্তরে ঠিকানাগুলো উল্লেখ করছি। বিপ্রদাস পালচৌধুরী জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (কৃষ্ণনগর); হুগলি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (হুগলি); ছোট জাগুলিয়া জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (নদীয়া); সুভাষনগর জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (বেঙ্গাই, হুগলি); স্বামী মহাদেবানন্দ শিল্প বিদ্যাপীঠ, ব্যারাকপুর; রামকৃষ্ণ

মিশন শিল্পায়তন (বেলুড় মঠ); সেবায়তন শিল্প বিদ্যালয় (সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম); হিজলি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (খড়্গপুর); সেন্ট জেভিয়ার্স জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (বাসন্তী) ইত্যাদি। মনে রেখো, মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর তুমি পলিটেকনিক জয়েন্ট পরীক্ষায় বসতে পারো। তবে বাস্তবে বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীই উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এজন্য অবশ্যই আলাদাভাবে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। কেননা, ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা রয়েছে।

স্বরূপা সিনহা চিঠি পাঠিয়েছে মেদিনীপুর থেকে। তার জিজ্ঞাসা মাধ্যমিক পাশের পর জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং নিতে হলে কী করতে হবে। তোমার চিঠির উত্তরে জানাই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ট্রেনিংয়ের গুরুত্ব রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচনের জন্যও হয়তো স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় বসতে হতে পারে। যা হোক, তখনও ইন্টারভিউয়ের সময় এই ট্রেনিংয়ের জন্য আলাদা নম্বর পেতে সুবিধা হবে। প্রতিটি জেলায় জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল বা কলেজ রয়েছে। মাধ্যমিকে নম্বর পাওয়ার ভিত্তিতেই ভর্তির সুযোগ পাওয়া সম্ভব। তোমাদের সুবিধার জন্য কয়েকটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করছি। যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা; বাণীপুর গভর্নমেন্ট জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা; বহরমপুর জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; জলপাইগুড়ি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি।

আরও বলে রাখি, বেসিক ট্রেনিং নেওয়ার সময় সরকারি স্টাইপেন্ড পাওয়া যায়। তাছাড়া কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

জানা-অজানা ● মহসীন মল্লিক

হাতি ও হাতির দাঁত

পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতাবিশিষ্ট হাতিটি পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার জঙ্গলে। এর উচ্চতা ছিল ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। শুঁড়ের ডগা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত চওড়ায় ৩৫ ফুট। সামনের পায়ের বেড় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি। বিশাল এই হাতিটির ওজন ছিল ২৬,৯৯৮ পাউন্ড। বিশ্বের বৃহত্তম এই হাতিটিকে চোরাশিকারীরা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গুলি করে হত্যা করেছিল।

আফ্রিকার কেনিয়া রাজ্যের 'মারসাবিট' জঙ্গলে আহমেদ নামে সুন্দর গজদন্তওলা একটি হাতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান জুবের। তার মূল্যবান দাঁত দুটির জন্যই চোরাশিকারীরা তাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিল। জুবেরের প্রচেষ্টায় কেনিয়া সরকার আহমেদকে জাতীয় গৌরবের জীবন্ত নিদর্শন হিসাবে ঘোষণা করে বিশেষ তৎপরতায় তার জীবনকে অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। কেনিয়ার ৩৪,০০০ হাতিদের মধ্যে আহমেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দৃষ্টিনন্দন দুটি গজদন্ত। ঠিক যেন খাপ খোলা দুটি বাঁকা তলোয়ার। আহমেদের উচ্চতা ছিল ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি। তার ডানদিকের দাঁতটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি, বামদিকের দাঁতটি ৯ ফুট ৪ ইঞ্চি। প্রতিটি দাঁতেরই ওজন ৬৭ কেজি করে। ১৯৭৪ সালে মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে হাতিটি মারা যায়। কেনিয়া সরকার তার একটি সুন্দর মূর্তি স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষিত করে রেখেছে নাইরোবির মিউজিয়ামে। পুরো মূর্তিটাই ফাইবার গ্লাসের তৈরি। দেখলে মনে হয় এই বুঝি শুঁড় তুলে এগিয়ে আসবে। এমন আশ্চর্য জীবন্ত মূর্তি পৃথিবীতে বিরল।

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গজদন্ত দুটি পাওয়া গেছে জাইরের জঙ্গলের একটি বিশাল হাতির কাছ থেকে। তার ডানদিকের দাঁতটির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৫১/২ ইঞ্চি, বামদিকেরটির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট। দুটি দাঁতের মিলিত ওজন ২৯৩ পাউন্ড। দীর্ঘতম এই গজদন্ত দুটি নিউইয়র্ক জুলজিক্যাল সোসাইটির ব্রংক্স পার্কের মিউজিয়ামে এখন শোভা পাচ্ছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ওজনের গজদন্ত দুটি পাওয়া গিয়েছিল তানজানিয়ার একটি হাতির কাছে। এর ডানদিকের গজদন্তটি দৈর্ঘ্যে ১০ ফুট ২১/২ ইঞ্চি, ওজন ২৫০ পাউন্ড। বামদিকের দাঁতটি ১০ ফুট ৫১/২ ইঞ্চি, ওজন ২৪৫ পাউন্ড। ১৮৯৭ সালে এই ওজনদার দাঁতওলা হাতিটিকে কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের পাদদেশে চোরাশিকারীর দল গুলি করে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে তারা ধরা পড়ায় দাঁত দুটি রক্ষা পায়। বিশাল ওই দাঁত দুটি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

রাতের সোলাঙ

অনিল বিশ্বাস

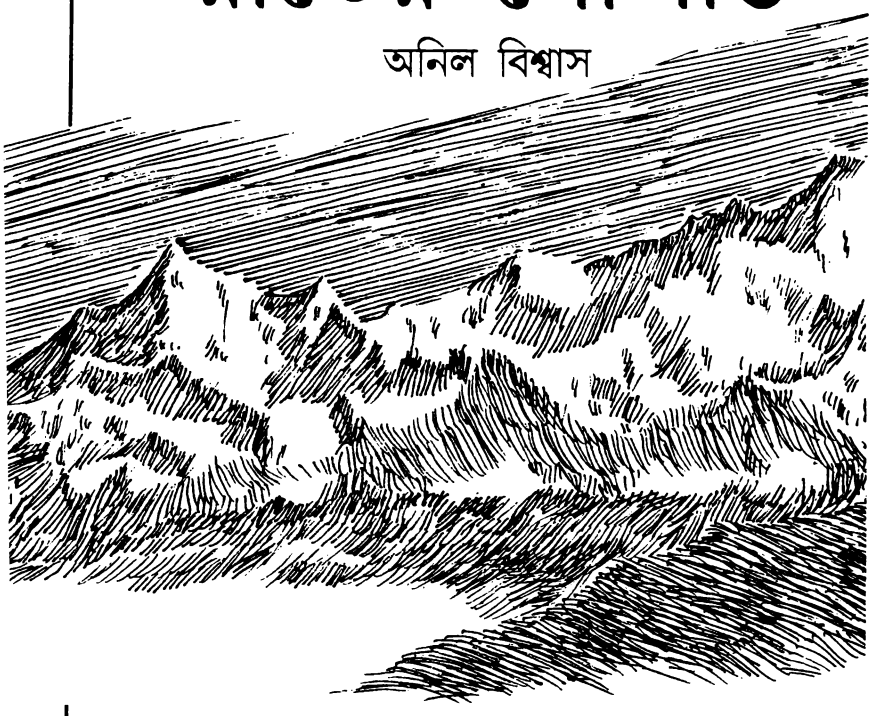

সময়টা মে'র মাঝামাঝি। সূর্যদেব তার প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। তবুও সে উত্তাপ ট্যুরিস্টদের দেহকে তাতিয়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। পর্বতের তুষারাবৃত চূড়াগুলো সূর্যের প্রখর আলোয় ঝলমল করছে। তার বুকে সুউচ্চ সরল সিলভার ওক আর দেওদার বৃক্ষরাজি তুষার-বল্কলে অপূর্ব শোভায় শোভিত হয়ে রয়েছে। তারই মাঝে নির্দিষ্ট সীমারেখায় এসে জমাট তুষার আহ্লাদে বিগলিত হয়ে, প্রস্রবিণী রূপে ঝরে পড়ছে নিচে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ে ক্ষীণ কলেবরা নদীর রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে আপন বেগে পাগল-পারা।

এই নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলছিল ওরা। ওরা অর্থাৎ সুকান্ত, সুবীর, সুব্রত এবং সুদীপ। এই চারজনকে নিয়ে একটা ট্যুরিস্ট দল। আর এই দলের দলপতি সুকান্ত।

সুকান্ত তার লাল মারুতি ভ্যানটা অতি দক্ষতার সঙ্গে ড্রাইভ করে এগিয়ে চলছিল সোলাঙ ভ্যালির দিকে। মানালিতে একটা বাঙালী হোটেলে রাত কাটিয়ে ভোর হতেই বেরিয়ে এসেছে।

রাস্তার মাঝে দেখতে পেলো কাঠের তৈরি ছোট ছোট দোকান। সেখানে বসে রয়েছে হিমাচল প্রদেশের মেয়েরা। সাজিয়ে রেখেছে নানা সাইজের গামবুট, হিমাচলপ্রদেশী মেয়েদের জোব্বা টাইপের পোশাক আর অলঙ্কার। ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে টাকা জমা রেখে সাইজমতো বুট-পোশাক দিয়ে দিচ্ছে ভ্যালিতে নামার জন্য এবং তুষারাবৃত পর্বতে আরোহণের জন্য।

সুকান্ত ভ্যানটা দাঁড় করালো একটা দোকানের সামনে। চার বন্ধুতেই টাকা জমা রেখে সাইজমতো গামবুট পরে নিলো। সঙ্গে আনা উইন্ডচিটারও তুলে নিলো গায়ে। তারপর আবার উঠে পড়লো গাড়িতে।

সোলাঙ ভ্যালি দেখার এবং রোটাং পাসে যাবার বাসনা তাদের অনেকদিনের। আর এই বাসনা নিয়েই তারা রওনা হয়েছিল দিল্লী থেকে। তাই যতোই এই ভ্যালি এগিয়ে আসছিল ততই আনন্দে অধীর হয়ে উঠছিল ওরা।

কাঠের ছোট্ট সেতুটা পার হয়ে যখন সোলাঙ ভ্যালির পাশে এসে পৌঁছালো, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ওরা। কী অপূর্ব! চোখ ফেরানো যায় না। রাস্তার ঠিক নিচে থেকেই শুরু হয়েছে এই ভ্যালি। তুষারে ঢাকা যেন এক বিস্তৃত সায়র। কতো ফুট উঁচু হয়ে জমে রয়েছে এই বরফের আবরণ তা না নামলে ঠিক জানা যাবে না।

যারা নেমে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কারও বা হাঁটু অবধি, কারও বা আরও বেশি ডুবে যাচ্ছে বরফের নিচে। খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলছে সবাই। বরফের নিচে গভীর খাদে পা পড়ে গিয়ে যাতে তুষার-সমাধি না হয়ে যায়, তাই লাঠির সাহায্যে আগেভাগে দেখে নিতে হচ্ছে এর গভীরতা। নয়তো কারও ফুটপ্রিন্ট দেখে নিয়ে সেখানে পা ফেলতে হচ্ছে।

ভ্যালির ধারে বসে ছিল দু'চারজন কিশোর গাছের ডাল-পালা থেকে কাটা লাঠি নিয়ে। ট্যুরিস্টরা সবাই কিনছিল ওই লাঠি ভ্যালিতে নামার আগে।

ওরা চার বন্ধুও চারটে লাঠি কিনে নিয়ে নেমে পড়লো ভ্যালিতে।

সুকান্ত দলপতি। সকলকে সাবধান করে দিলো, বরফের মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে গভীরতা দেখে নিয়ে তবে পা ফেলতে। সবাই খুশিতে উপচে পড়লো। সুবীর বললো, এসো গুরু আরাম করে শুয়ে পড়ি এই শুভ্র তুষারশয্যায়। হেসে উঠলো আর তিনজনে ওর কথা শুনে।

শুধু ওরাই চারজন নয়। আরও ট্যুরিস্ট যারা নেমেছে তাদের মধ্যে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী। সকলের হৈ-হল্লায় মুখর হয়ে উঠেছে ভ্যালি।

বেশির ভাগ সবাই ব্যস্ত ফটো তুলতে। কেউ কেউ আবার বরফের গোলা তৈরি

করে ছুঁড়ে মারছে এ ওর দিকে। গায়ে লেগে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তা চারদিকে। তাই দেখে আনন্দে ফেটে পড়ছে সবাই।

বিস্তীর্ণ ভ্যালি কিছুদূর গিয়েই এক জায়গায় শেষ হয়ে খাড়া নেমে গিয়েছে অনেক নিচে যেখানে লাঠি গুঁজে দেখতে গেলে সে লাঠি তুষার-সমুদ্রে ডুবে যাবে। আর যদি কারও অসাবধানে পা পড়ে সেখানে তা হলে সেই সমুদ্রে চিরসমাধি হয়ে যাবে সুনিশ্চিত। তাই সুকান্ত সকলকে কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করতে বললো।

ভ্যালির একপাশে স্লেজগাড়িগুলো নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরা ওই স্লেজগাড়ি ভাড়া নিয়ে তাদের বসিয়ে ঘোরাচ্ছে।

সকাল থেকে কতো ট্যুরিস্ট যে এলো আর কতো চলে গেলো তার অন্ত নেই। কিন্তু ওদের চার বন্ধুর ওঠার নাম নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন ভুলে গিয়েছে ওরা।

বেলা বাড়ছে। সূর্য জ্বলছে। ভ্যালির বুকে ঠিকরে পড়ছে লক্ষ হীরার দ্যুতি। এ যেন এক হীরক রাজার দেশ! এর অতুল ঐশ্বর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে সীমাহীন আনন্দে ফেটে পড়তে লাগলো চার বন্ধু।

॥ ২ ॥

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসতে লাগলো। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো একটু একটু করে। সোলাঙ ভ্যালিতে ট্যুরিস্টদের ভিড়ও কমতে লাগলো। শেষে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলো। দু'একটা গরম পানীয়ের অস্থায়ী স্টল যা ছিল তাও গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলো দোকানীরা। হিমাচলপ্রদেশের মেয়েদের পোশাক নিয়ে যেসব মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারাও চলে গিয়েছে অনেক আগে। এখন সেই শূন্য ভ্যালিতে মাত্র ওরা চারজন।

ওরা স্থির করলো এখানে ভ্যার্নের মধ্যেই রাত কাটাবে। ফিরে যাবে না মানালির হোটেলে। তাছাড়া কাল সকাল থেকেই খুলে যাবে রোটাং পাসের রাস্তা। সে রাস্তা এখান থেকে খুব কাছেই।

যে সোলাঙ দিনের আলোয় এতো সুন্দর তা রাতের আঁধারে, নির্জনতায় আরো কতো সুন্দর দেখায় তা চাক্ষুষ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে এলো চার বন্ধু ভ্যালির বুক থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো শূন্য ভ্যালির নয়নাভিরাম দৃশ্য!

এখন ট্যুরিস্টদের কোলাহল মুছে গিয়েছে। নেমে এসেছে স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিচ্ছে ঝর্ণা-ধারার ছমছম একটানা শব্দ।

সূর্য এখানে ডোবে অনেক দেরিতে। প্রায় সাতটা বাজে। তখনও সিলভার ওকের ফাঁক দিয়ে সূর্যের শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে তুষারাবৃত সোলাঙ ভ্যালিতে। সারা ভ্যালি বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। বর্ণালী আকাশের বুকে ডানা মেলে ক্লান্ত পাখির দল ফিরে চলেছে তাদের অরণ্য-নীড়ে।

ধীরে ধীরে সূর্যদেব তার শেষ আলোটুকু গুটিয়ে নিয়ে নেমে গেলো অরণ্য-পর্বতের পেছনে। মুহূর্তের মধ্যে নেমে এলো আঁধার চারদিকে।

বাতাস এখন ঝড়ের বেগে বইতে শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো ওদের। তবুও ওরা সেখানে রাত কাটানোর সিদ্ধান্তে অটল রইলো।

শুধু উইন্ডচিটারই নয়। যতো কিছু গরম পোশাক এনেছিল সব একে একে জড়িয়ে নিলো গায়ে। তারপর ঢুকলো ভ্যানের মধ্যে। একটুখানি খোলা রেখে সব শার্সি বন্ধ করে দিলো। এ যেন এক দুঃসাহসিক অভিযান ওদের।

আঁধার নেমে আসতেই রাতের সোলাঙ রূপ পাল্টে ফেললো। এখন শুধু চাপ চাপ কালো অন্ধকার। বাঁদিকে সুউচ্চ সরল সিলভার ওকগুলোতে এবং সোলাঙের ওপারে পর্বতের বুকে নিবিড় অরণ্যকে আর চেনা যায় না, দেখা যায় না। সে যেন আঁধারের জগত। সেখানে কোনোদিন আলো প্রবেশ করেছে বলে মনে হলো না। আর সেই আঁধারের মধ্যে বিস্তীর্ণ ভ্যালি শুভ্র তুষারের আবরণ বুকে জড়িয়ে ওদের চার বন্ধুর চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে রইলো।

সুকান্ত ছাড়া আর তিন বন্ধুর এবার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। তবুও ভয়-মিশ্রিত এক আনন্দে ওরা আত্মহারা হয়ে উঠলো।

সুকান্ত আসার সময় তার রাইফেলটাও সঙ্গে এনেছিল। ওর বাবা এক্স মিলিটারি ম্যান। সুকান্ত নিজেও স্কুল-কলেজ জীবনে এন. সি. সি. ট্রেনিং করেছে। তাই রাইফেলের লাইসেন্স পেতে বেগ পেতে হয়নি। সুতরাং তিন বন্ধু ভয় পেলেও ভরসা ওদের সুকান্ত।

ওদের গাড়ির ডান দিকে শূন্য সোলাঙ ভ্যালির বুক থেকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া শব্দ করে ছুটে এসে গাড়ির শার্সির বুকে আছড়ে পড়ছে। বাঁ দিকের সিলভার ওকগুলোতে অন্ধকারে ঠিকমতো দেখা না গেলেও বাতাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওদের শাখা-প্রশাখা আর শীর্ণ পাতাগুলোর যে শিহরন-জাগানো হিস হিস শব্দ উঠছে তা থেকে ওদের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোথা থেকে ভেসে আসছে রাত-জাগা পাখি এবং কোনো পশুর ডাক।

ওরা খাবার যা এনেছিল খেয়ে নিলো। তারপর ফ্লাস্ক থেকে গরম পানীয় পান করে কিছুক্ষণ বসে রইলো নিঃশব্দে। প্রহর গুনতে থাকলো বিস্তীর্ণ ভ্যালির দিকে দৃষ্টি রেখে।

তিন বন্ধুর চোখে ঘুম নেমে এলেও, সুকান্ত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না। জেগে বসে রইলো রাইফেলটা হাতের নাগালের মধ্যে রেখে। কিন্তু এমন অন্ধকার রাত, ঝড়ো বাতাস, নাম-না-জানা পশু-পাখির ডাক আর প্রস্রবিণীর একটানা ছমছম শব্দে সৃষ্টি এই অলৌকিক জগত তাকে বেশিক্ষণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো জাগিয়ে রাখতে পারলো না। তারও দু'চোখ ভরে নেমে এলো গভীর ঘুম।

॥ ৩ ॥

সহসা কার যেন ডাক শুনে সুব্রতই প্রথম ভয়ার্ত চোখ মেলে ধরলো! জাগিয়ে দিলো আর তিন বন্ধুকে! উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলো চার বন্ধুতেই ভ্যালির দিকে। সকলের চোখেই বিস্ময়, মনে দারুণ শঙ্কা ছড়িয়ে পড়লো।

কার ডাক? কোন-দিক থেকে আসছে? চিন্তা করতে লাগলো ওরা। আর ঠিক তখনই আবার শুনতে পেলো নারীকণ্ঠের সেই কান্না-জড়িত ডাক, থিরু, থি-রু...উ.. সারা ভ্যালিকে মথিত করে সে-ডাক রাতের উত্তল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

দু'তিন দিন আগে চলে গিয়েছে পূর্ণিমা তিথি। চাঁদ উঠেছিল একটু দেরিতে। এখন সেই চাঁদের আলো হাল্কা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে গলে গলে পড়ছে চারদিকে। সে-আলোয় সারা সোলাঙ ভ্যালির যে কী অপরূপ রূপ ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করা যায় না। কোথাও গলিত রজত, কোথাও গলিত কাঞ্চন। দুই বর্ণে মাখামাখি করে অপরূপ সাজে সেজেছে সোলাঙ-সুন্দরী।

কিন্তু আবার সেই ডাক! থিরু... থিরু...উ...উ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলো চার বন্ধু ভ্যালির দিকে। না, কিছু দেখতে পেলো না।

একটু ভালো করে দেখতেই এবার দেখা গেলো তাকে। হিমাচলপ্রদেশী এক যুবতী। মাথা থেকে শুরু করে সারা দেহ এ-দেশীয় পোশাকে ঢাকা। সারা পোশাকে আটকে রয়েছে বরফ-কুচি। চাঁদের আলোয় ঝিকঝিক করছে সে পোশাক। কানে বড়ো বড়ো কর্ণ-বলয়েও আটকে রয়েছে তুষার-কণা।

কে এই যুবতী! এতো রাতে, এ শূন্য ভ্যালিতে! রেডিয়াম লাগানো ঘড়িতে অন্ধকারেই দেখলো সুকান্ত। এখন রাত দুটো।

এবার চলতে লাগলো সেই নারীমূর্তি সামনের দিকে। ব্যাপারটা এতোক্ষণে লক্ষ্য করলো সুদীপ। গুরু, দেখতে পাচ্ছো মেয়েটির পরা পোশাকটাই শুধু চলছে। কিন্তু ওর মধ্যে কোনো দেহ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওই কর্ণ-বলয় যা দেখা যাচ্ছে ও দুটোও দুটো কানকে আশ্রয় করে রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো দেহের কোনো অংশ দেখা যাচ্ছে না। বরফের মধ্যে থেকে পা-ও তো তুলছে না। মনে হচ্ছে বরফের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

ওই পোশাকের ভেতর থেকেই আবার আওয়াজ উঠলো, থিরু...থি...র-উ..উ...। ডাক তো নয়। যেন বুকফাটা আর্তনাদ।

এবার এতো ঠাণ্ডাতেও ঘামতে লাগলো চার বন্ধু। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখে যেতে লাগলো এই দৃশ্য।

বিস্তীর্ণ ভ্যালির মধ্য দিয়ে সোজা উত্তরমুখী হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো সেই যুবতী। অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে মনে হলো নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, যেখানে খাড়া হয়ে নেমে গিয়েছে এই ভ্যালি অনেক নিচে। কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়েই যেন ঝুপ করে তলিয়ে গেলো। তার থি-রু ডাক শেষবারের মতো ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। শূন্য ভ্যালির বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

চার বন্ধুর চোখে আর ঘুম এলো না। জেগে বসে রইলো। ভাবলো যদি আরও ভয়ঙ্কর এমনি কিছু দেখা যায়! এইভাবে জেগে বসে থাকতে থাকতেই এক সময় ভোরের আভাস ফুটে উঠলো। সিলভার ওকের অরণ্য-মধ্য থেকে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে এলো প্রথম বিহঙ্গদল। তাদের কল-কাকলিতে চারদিক মুখরিত করে ভ্যালির ওপর দিয়ে উড়ে গেলো তারা পুবের দিশায়।

অস্থায়ী দোকানীরা আর পোশাক নিয়ে হিমাচলপ্রদেশী মেয়েরা দু'একজন করে আসতে লাগলো ভ্যালির ধারে। রাতের সেই ভয়ঙ্কর সোলাঙ ভ্যালি আবার হয়ে উঠলো অপরূপা!

প্রথম চায়ের স্টল খুলে বসলো হিমাচলপ্রদেশী যুবক গুড়ুং। তার মুখ থেকেই আসল ঘটনাটা শুনলো ওরা চার বন্ধু।

॥ ৪ ॥

পাহাড়ী মেয়ে কাঞ্চী প্রতিদিন আসতো এখানে মেয়েদের পোশাক আর নানারকম আভরণ নিয়ে ট্যুরিস্টদের কাছে। সঙ্গে আসতো তার পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে থিরু। সে-ও ঘুরতো মায়ের পিছু পিছু।

সেবার ট্যুরিস্ট ভেঙে পড়েছিল সোলাঙ ভ্যালিতে। ভিড়ের বহর দেখে কাঞ্চী খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিল। নেমে পড়েছিল ভ্যালিতে। ঘুরছিল পোশাক নিয়ে ট্যুরিস্টদের পিছু পিছু।

ওই ভিড়ের মধ্যে থিরুও যে কখন নেমে এসেছিল ভ্যালিতে তা লক্ষ্য করেনি কাঞ্চী। মেয়ে ট্যুরিস্টরা যারা পোশাক নিচ্ছে, তাদের সে-পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে কাঞ্চী। ফটো তোলা হলে পোশাক তাদের গা থেকে খুলে নিয়ে আবার পরিয়ে দিচ্ছে অন্যজনকে। খুশি আর ধরে না তার। এবার পোশাক পরিয়ে ভালো টাকাই পাচ্ছে সে। কিন্তু এই খুশির মধ্যে খেয়াল করেনি যে থিরু কখন নেমে এসে ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে লেগেছে।

একটু বেলা বাড়তেই বাতাসের বেগ হু হু করে বাড়তে শুরু করলো। আকাশ রূপ পাল্টে ফেললো। পাখির দল সিলভার ওকের আশ্রয় ছেড়ে দিশাহারা হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো আকাশের বুকে। স্থানীয় লোকেরা সতর্কবাণী ঘোষণা করলো, তুষার-ঝড় উঠছে! সবাই উঠে এসো! পালাও, পালাও!

মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো তুষার-ঝড়। ট্যুরিস্টদের গা থেকে তাড়াতাড়ি পোশাকগুলো খুলে নিয়ে ওপরে এসে খুঁজতে থাকে কাঞ্চী থিরুকে।

কিন্তু কোথায় থিরু! কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে! সবাই তো প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলো কাঞ্চী, থিরু...থি-র-উ-উ...। লাফ দিয়ে সে আবার নেমে পড়লো ভ্যালিতে।

বরফের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

ততোক্ষণে ভ্যালি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ট্যুরিস্টরা সবাই ভ্যালি থেকে উঠে এসে যে যার গাড়ি ছুটিয়ে চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে ট্যুরিস্ট বাসও। যারা দোকান লাগিয়েছিল তারাও তাদের জিনিসপত্র কিছু নিয়ে, কিছু ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। যাবার সময় তাদের মধ্যে কেউ হয়তো কাঞ্চীকে পালিয়ে আসতে বলেছিল। কিন্তু তাদের কোনো কথাই তার কানে যায়নি। সে শুধু বুক-ফাটা আর্তনাদ করে থিরু থি-র-উ-উ বলে সারা ভ্যালিতে ছোটাছুটি করতে লাগলো। সারা দেহ তার তুষার-কণায় ঢেকে যেতে লাগলো।

হঠাৎ তার কেন জানি মনে হলো, এই ভ্যালি যেখানে খাড়া হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে, অবোধ শিশু তার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ভুল করে সেখানে গিয়ে গভীর তুষারের মধ্যে ডুবে যায়নি তো!

চারদিক ঝাপসা হয়ে উঠেছে। কিছু দেখা যায় না। তবু প্রাণের ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে থিরু থিরু বলে চিৎকার করতে করতে সেই দিকেই ছুটে গেলো কাঞ্চী।

হয়তো ছেলের সঙ্গে মা-কেও টেনে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল ওই ভয়ঙ্কর জায়গাটা। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। ঠিক কোথা থেকে খাদ শুরু হয়েছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। লাঠি গুঁজে দেখে নেবার মতোও তার সময় নেই। তুষার-কণায় আর চোখের জলে মাখামাখি হয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই দিকের এক জায়গায় আসতেই ভস করে তলিয়ে যেতে লাগলো কাঞ্চী তুষারের ভেতর। উঠে আসার চেষ্টা করতে লাগলো। পারলো না। শেষবারের মতো একবার থিরু বলে চিৎকার করতেই ওপর থেকে তুষারের ধস ভেঙে পড়লো তার মাথার ওপর। আর শোনা গেলো না তার ডাক। তুষার-সমাধি হয়ে গেলো কাঞ্চীর।

দু'দিন দু'রাত ধরে সেবার তুষার-ঝড় বয়ে গিয়েছিল এই সোলাঙ ভ্যালির ওপর দিয়ে। বেশ কয়েক ফুট উঁচু হয়ে তুষার জমেছিল এই ভ্যালিতে।

দু'দিন পরে আবার সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল এর ওপর। আবার অপরূপ সাজে সেজে ট্যুরিস্টদের কাছে টেনেছিল সোলাঙ-সুন্দরী। তাদের বুকে নিয়ে প্রতিবছরই উদ্দাম হয়ে ওঠে সে। কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে সবাই ভুলে গিয়েছে এই মর্মন্তুদ ঘটনা। ভুলে গিয়েছে এই শুভ্র তুষারশয্যার নিচে চিরতরে ঘুমিয়ে থাকা মা ও ছেলেকে। আজ আর কেউ মনে রাখে না।

কেউ মনে না রাখলেও প্রতিদিন কিন্তু গভীর রাতে স্নেহময়ী মা কাঞ্চীর অশরীরী আত্মা এক বুকফাটা কান্না নিয়ে ডেকে চলে থিরু...থি-র...উ...উ...। আর সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ে এই সোলাঙ ভ্যালির চারধারে রাতের উতল বাতাসে।

ঘটনাটা গুরুংয়ের মুখে শুনে নিয়ে ভ্যান ছেড়ে দিলো সুকান্ত রোটাং পাসের দিকে। আজ থেকেই ওই রাস্তা ট্যুরিস্টদের জন্য খুলে যাবার কথা।

ছবিঃ দিলীপ

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্রশ্নঃ আমি 'মনের জানলা' বিভাগের নিয়মিত পাঠিকা। আমি বাংলা স্পেশাল অনার্স-এর ছাত্রী। আমার প্রথম সমস্যা হলো, হাতের লেখা খুব খারাপ, বানানও খুব ভুল হয়, ফলে পরীক্ষার নম্বর কমে যায় এবং কারোকে হাতের লেখা দেখাতে খুব লজ্জা করে। আমার দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, আমরা দুই বোন। আমি বড়। আমার বাবা, মা অনেকদিন অসুস্থ থাকার দরুন আমাকে ঘরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কাজগুলিও বাবার হয়ে করে দিতে হয়। বাবা কোনোমতে কেবল অফিসটুকুই করেন। এছাড়া আমার পড়া, কলেজ যাওয়ার ফলেও বাইরে বেরোতে হয়। আমার এই বাইরে বেরনো লোকে ভাল চোখে দেখে না যেহেতু আমি মেয়ে। তারা এই নিয়ে নানারকম বিদ্রূপ করে। ফলে একদিকে আমার নিজেকে যেমন ছোট মনে হয়, অপরদিকে তেমনি আমার মাথা প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়। নিজেকে সংযত রাখতে পারি না। কি করলে এইসব সমস্যা থেকে আমি মুক্তি পাব?
—রুমি, মুর্শিদাবাদ

উত্তরঃ হাতের লেখা ভাল করার একমাত্র উপায় নিয়মিত অনুশীলন। প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা করে হাতের লেখা পরিচ্ছন্নভাবে practise করবে। তুমি এখন অনার্স পড়ছ বলে যদি মনে কর যে ছোটদের মতো এরকম practise করা সম্ভব না তবে তোমার হাতের লেখার উন্নতি হবে না। নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ম করে তোমাকে হাতের লেখার অভ্যাস করতেই হবে মানে ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্নতা রেখে, মার্জিন রেখে স্পষ্টভাবে অক্ষরগুলি লিখে হাতের লেখার অভ্যাস করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আরেকটা কথা মনে রাখবে, মনের সঙ্গে হাতের লেখার একটা সম্পর্ক আছে। মন যত দৃঢ় ও গোছানো হবে (organised), তোমার হাতের লেখাও তত পরিচ্ছন্ন ও গোছানো হবে। কাজেই মনটাকেও অহেতুক ভয়, লজ্জা থেকে মুক্ত করে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। এলোমেলো চিন্তা মাথায় ঘুরলে হাতের লেখাও এলোমেলো হয়ে যাবে। বানান ভুল দূর করার উপায় দুটি—প্রথমত বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরাজী Grammar একদিকে যেমন ভাল করে পড়তে হবে, ইংরাজী ও বাংলা বানানের নিয়ম নির্দেশ জানার জন্য অন্যদিকে প্রতিদিন বাংলা ও ইংরাজী Dictionary থেকে পনেরটি করে শব্দের বানান, সেই শব্দের অর্থ জেনে বারবার লিখবে ও মুখস্থ করবে। বানান মুখস্থ করা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। এছাড়া ইংরাজী ও বাংলা বই—পাঠ্যপুস্তকই হোক বা গল্পের বই হোক মনোযোগ দিয়ে ধরে ধরে পড়বে। এতে তোমার শব্দভাণ্ডার বেড়ে যাবে, বানান ভুলও কমে যাবে।

তোমার বাবা-মা অসুস্থ থাকার জন্য তোমাকে যে ঘরের ও বাইরের কাজ দুইই করতে হচ্ছে এবং তুমি তা লেখাপড়া করেও করে যাচ্ছ এর জন্য তো তুমি কর্তব্যপরায়ণা কন্যা হিসাবে সকলের সাধুবাদ পাওয়ার ও আদর্শ হিসাবে সকল আত্মীয়-স্বজনের ও পাড়া-প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তার বদলে তোমার বাইরে যাওয়া নিয়ে যদি কেউ অহেতুক সমালোচনা করে তাহলে তুমি তাকে আবর্জনার মতো অগ্রাহ্য করবে। তুমি তোমার নিজের কাছে ঠিক থাকলে, কে কি বলল আর ভাবল তাতে কি এসে যাবে। যার যে রকম দৃষ্টি ও রুচি বাইরে থেকে সে সবকিছু সেইভাবে বিচার করার চেষ্টা করে। কাজেই এ নিয়ে একেবারে মাথা ঘামাবে না। তুমি বাংলা অনার্স নিয়ে ভাল করে পড়াশুনা করে ভাল ফল করে আমাদের জানাবে।

প্রশ্নঃ আমি ক্লাস নাইনের ছাত্রী। ইদানিং আমি খুব চঞ্চল হয়ে গেছি যার জন্য পড়াশুনায় মন বসাতে পারছি না। আমি পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো। আমার সমস্যা হলো আমি প্রতিবার ক্লাসের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় ফার্স্ট গার্লের থেকে ৩৫-৪০ নম্বর বেশি পেয়ে ফার্স্ট হই কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেও ফার্স্ট হতে না পেরে সেকেন্ড হয়ে যাই। এজন্য যাঁর কাছে ব্যক্তিগত কোচিং-এ পড়ি তিনি বলেছেন এবার আমি প্রথম না হলে তিনি আর আমাকে পড়াবেন না। এজন্য খুব চিন্তায় আছি। তাছাড়া আমার বন্ধুরাও আমার সঙ্গে এখন তেমনভাবে মেশে না। সবার বক্তব্য আমি আগে ভালো

ছিলাম, এখন খারাপ হয়ে যাচ্ছি। আমার অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে তারা নানা সমালোচনামূলক কথা আলোচনা করে, কোনো দোষ তারা নিজেরা করলে আমার ঘাড়ে সেই দোষ চাপাতে চেষ্টা করে। অথচ আমি চাই সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে ও বন্ধুত্ব বজায় রাখতে। তাই কি করলে ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারব ও বন্ধুদের আগের মতো ফিরে পাব তা আমাকে জানালে আমি বিশেষ উপকৃত হব।

—মঞ্জুশ্রী করণ, মেদিনীপুর

উত্তরঃ তুমি হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় প্রথম হও অথচ অ্যানুয়াল পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়ে যাও এটার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার কথা নয়। অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় তোমার কি খুব নার্ভাস লাগে? সবসময় মনে রাখবে পরীক্ষায় ফার্স্ট, সেকেন্ড হওয়াটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হলো সারা বছর নিয়মিতভাবে ক্লাসের পড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াশোনা করে যাওয়া। পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। নিয়মিত সঠিকভাবে পরিশ্রম করলে ফল তুমি পাবেই। পরীক্ষা ব্যাপারটাকে খুব স্পোর্টিংলি নেবে। খেলায় যারা ভালো তারা কি করে, সারা বছর নিয়মিত অনুশীলন করে, খেলার মাঠে ভাবে খেলায় জিততেও পারি, হারতেও পারি। খেলার মাঠে ঢোকার আগে খেলোয়াড় যদি কেবল ভাবে যে, আমাকে জিততেই হবে, তার জন্য প্রচণ্ড টেনশন করতে থাকে, তাহলে মনে রাখবে খেলায় ভালো ফল করতে যে স্টেডিনেস দরকার সেটা নষ্ট হবে এবং সেই খেলায় সে সারা বছর পরিশ্রম করেও খারাপ ফল করবে। লেখাপড়ার বেলাতেও ঠিক একই নিয়ম। পরীক্ষা যখন দিতে যাবে তখন খুব হালকা মন নিয়ে যাবে মানে খুব রিল্যাক্সড থাকবে। আমি সারা বছর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করেছি ব্যস, পরীক্ষায় যা হয় হবে। এরকম মানসিকতা বজায় রেখে পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দেবে। দেখবে পরীক্ষার ফল ভালো হবে। আর এছাড়া ফার্স্ট হলে বা সেকেন্ড হলে এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে? তুমি পড়াশোনায় বেশ ভালো, ফার্স্ট হলেও ভালো, সেকেন্ড হলেও ভালো। তোমাকে যিনি পড়ান, তুমি ফার্স্ট না হলে তিনি তোমাকে পড়াবেন না এই ভাবনাটা ঠিক নয়। মাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে বলবে। আর তুমি পরীক্ষায় সেকেন্ড হও বলে তোমার বন্ধুরা তোমার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে এটাই বা কিরকম? বন্ধুত্ব, ভালবাসা এসব কি পরীক্ষার ফল দিয়ে হবে না তোমার সুমধুর ব্যক্তিত্ব ও আচরণ দিয়ে হবে? বন্ধুদের সঙ্গে খোলামনে মেশো। মনে রাখবে ক্লাসের পরীক্ষাই শেষ কথা নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলটাই তোমার স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষার ফল। সেটায় খুব ভাল করলেই তোমার আসল জয়। তুমি এইরকম একটা দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে চলবে, পড়াশুনা করবে ও সকলের সঙ্গে মেলামেশা করবে।

জানো কী!

- ☐ *সকালবেলায় কাগজ পড়তে বসে ছোট্ট একটি ভ্রম সংশোধনের খবরের ওপর চোখ পড়তেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ধর্মদাসবাবু। কেন?*
- ☐ *অরিন্দমের গলাটা খুব ক্লান্ত শোনাল। যেন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। দু'একটা কথা বলার পরই ফোনটা ছেড়ে দিলো। এমনটা তো সে কখনো করে না। ফোনে কত গল্প করে। অথচ আজ...*
- ☐ *উপস্থিত বুদ্ধি ও মেধার সাহায্যে চিরশত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হবে। আর্থিক লাভও হবে। নিজের রাশিফলটা দেখেই সাহসী হয়ে উঠল অয়ন। বুক ফুলিয়ে মুখোমুখি হলো সহপাঠী গোল্লার।*
- ☐ *যুদ্ধ শেষ। বাড়ি ফিরছিল একজন সৈনিক। পথে এক বুড়ির সঙ্গে দেখা। বুড়ি বলল, একটু পরিশ্রম করলেই সৈনিকটি অনেক ধন-সম্পদ পেতে পারে। কী করবে সৈনিক? তার পকেটও যে একদম খালি।*
- ☐ *দুজনেই দুজনকে আঘাত হানতে তৈরি। একদিকে ব্ল্যাক ক্যাট অন্যদিকে গিলবার্ট। কে প্রথম আঘাত হানবে?*

এইসব প্রশ্নের উত্তর শুকতারার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পাবে। সঙ্গে আরও অনেক কিছু।

লুসিফার মাফিয়া দলের নেতারা আবার গোপন সভায় মিলিত হলো.....

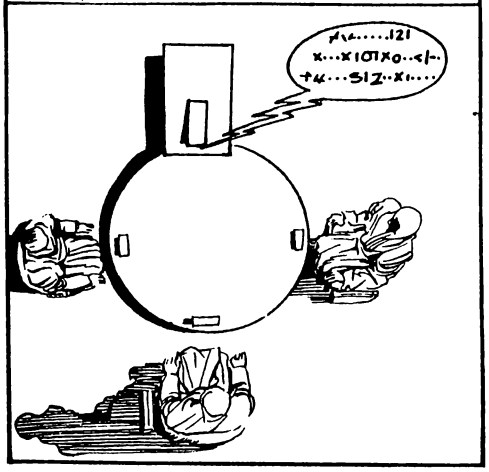

মুখোশ পরা শয়তানটা দেখছি আমাদের চিন্তায় ফেলে দিলো। এইভাবে আমাদের কাজে বাধা দেবার সাহস.....

চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি পাহাড়ী গ্রাম...

সেই মুহূর্তে একটি গোপন জায়গায় যোগসাধনা চলছে

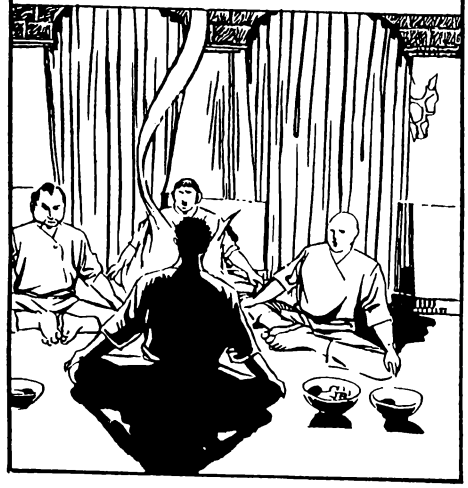

একজন বিশ্বস্ত অনুচর এসে ঘরে ঢুকলো.....

সানজায় এসেছে.....
কে ?
সানজায়.....
উনি এক্ষুণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন.....
হু....উ....ম...
মুহূর্তের মধ্যে উনি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন
ওদিকে তখন ব্ল্যাক ক্যাটের গোপন ডেরায়
গিলবার্ট নির্ঘাৎ এখনো ওদের সঙ্গে আছে..... আমার কথা জানতে পারলে ও এসে হাজির হবেই.....
দু'জন রেড-বেল্ট মিনজার মধ্যে প্রভুত্ব করবে একজনই
....হ্যাঁ .....একজনই.....অনাজনকে.....
টাইগার রেডি হয়ে নে। ওরা এখানে আসার আগে আমাদেরই ওদের ওখানে গিয়ে হাজির হতে হবে.....
১২

মজার পাতা

নতুন শব্দমালা

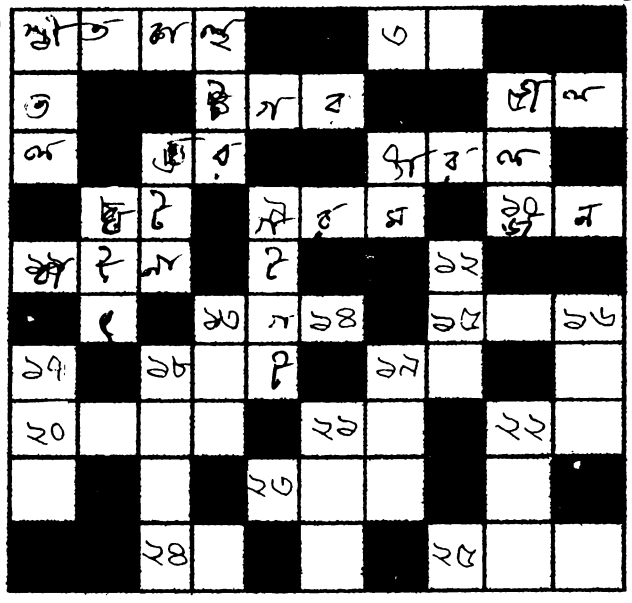

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ

১. জামার ওপর জামা পরার সময়
৩. প্রস্ফুটিত কলি
৪. সাদা ফুল বিশেষ
৫. অবশ্য পানীয়
৬. বাসস্থান
৭. সুধা নয়
৮. শুভ কাজে ব্যবহৃত ছোট কলসী
৯. গর্মি
১০. লোক বা মজুর
১১. — বাটা
১৩. চলা
১৫. সীতার আরেক নাম
১৮. উল্টেপাল্টে পলতা গাছের ফল
১৯. পুরুষ হয় সে
২০. দিন ও রাতি নিয়ে
২১. আপন নয়
২২. অন্ন
২৩. খুব
২৪. নৌকা
২৫. উল্টেপাল্টে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র

উপর-নিচঃ

১. বরফ এমন হয়
২. 'মাটির পুতুল — পটর'
৫. জলে জন্মে
৬. যা ঘটে
৭. খাদ্যশস্য বিশেষ
৮. কুন্তীর নাতি —কচ
৯. তেজের সঙ্গে হাঁটা
১২. যেখানে শাক-সবজি বিক্রি হয়
১৩. ভুল
১৬. ই-কার যোগে অদ্ভুত
১৭. পারস্যের হামলাবাজ
১৮. যার জয় হয়নি
১৯. তুলতুলে
২১. শ্রেষ্ঠ বা মহৎ
২২. এক মহান দেশ

এটি তৈরি করেছে দীপ্তিময় মজুমদার (বয়স ৮, তৃতীয় শ্রেণী), লক্ষ্মীনারায়ণ রোড, কলি-৬৫।

এই মাসের প্রশ্ন

সমকালীন নাট্যজগতে বিখ্যাত এক ব্যক্তির ছবি, যাঁর বহু নাটক বাংলায় অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। বলতে পারো এই বিখ্যাত নাট্যকারের নাম কি? কোন দেশের লোক ??

নতুন ধাঁধা

মজার পাতা

নতুন মজা

১. তিন অক্ষরে জায়গার নাম
এক মহান নেতার জন্মস্থান,
উল্টেপাল্টে যাই কর না
সদা একই হবে।

দীপেন বসাক
জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড/কলিকাতা-৩৭

২. খাগড়া গাছে ঘেরা হেথায়
মানুষ করে বাস,
মুখ বুজে থাক, যদি তোরা
শিবের দেখা চাস।

বাবলি ও তিতলি
ছত্রিশগণ্ডা/বর্ধমান

৩. এক-দুই মূল্য পেলে
বাকিটুকু শরীরে,
সবটা উল্টে বিপদ ভাই
পুরে দেবে জেলে।

ছন্দক ও ছন্দ্রশ্রী বিশ্বাস
কাস্টমস্ কোয়ার্টার/আগরতলা

৪. উল্টো-সোজা একই কথা
মানুষেরই নাম সেথা,
তৃতীয় ষষ্ঠে জনক নাতি
দ্বিতীয় পঞ্চমে খেলার সাথী।

তন্ময় রায়
জগদ্দল/উঃ ২৪ পরগনা

এমনভাবে দুটি সরলরেখা এই ঘড়ির ডায়ালে টানো যাতে তিনভাগে বিভক্ত ডায়ালটির প্রতিটি খণ্ডে সংখ্যার যোগফল সমান হয়॥

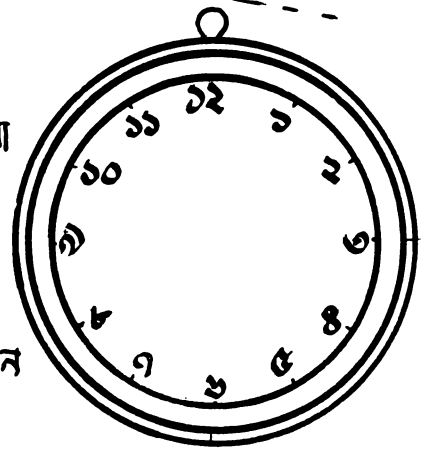

এখানে তিনটি সরলরেখা এমনভাবে টানো যাতে ফুলগুলি কাঁটা থেকে সহজেই আলাদা হয়॥

ভাদ্র মাসের নতুন ধাঁধার উত্তরঃ

১. রসগোল্লা ২. পালংশাক ৩. ময়না ৪. বসন্তসখা (কোকিল)

ভাদ্র সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ ১. শকুন্তলা ৪. বিদ্যাবিস্তার ৮. রাত ৯. ঘটনা ১১. লবঙ্গ ১২. অবকাশ ১৩. কবি ১৪. তলব ১৬. নক্তক ১৮. পদবি ১৯. তরঙ্গ ২১. ঘিসিং ২২. ফেরত ২৩. শবর ২৫. কনক ২৭. বসু ২৯. কথা কম ৩২. জবাব ৩৪. মানদ ৩৫. পচা ৩৬. বেসরকারি ৩৭. মন্দোদরী

উপর-নিচঃ ১. শরাফত ২. কুত ৪. বিনাশন ৫. বিল ৬. স্তাবক ৭. রঙ্গবিরঙ্গ ১০. টকা ১২. অবদংশ ১৫. লপসি ১৭. কতরকম ২০. রতন ২১. ঘি জবজবে ২৪. রকমারি ২৬. কর্মচারী ২৮. সুরস ৩০. থান ৩১. কদম ৩৩. বর ৩৫. পদ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

।। কলকাতা ।।

পিংকু, শান্তনু, মহাশ্বেতা ও মা/বেলেঘাটা, কলি-১০; অভয়, পূবালী, শৌভিক, মা ও বাবা/অটলবিহারী বসু লেন, কলি-১১; রনি, বনি, সিজু ও পিকলু/শরৎ বোস রোড, কলি-২৯; জয় বসু, শতরূপা বাগচী, রঞ্জিত ও মালবিকা/হিন্দুস্থান পার্ক; দীপ, মিমি, রিমি, ঝিমি, অনি, বাবীন, স্বপন, শুক্লা, তরুণ, সুনন্দা, চুনী ও কবিতা/যাদবপুর, কলি-৩২; স্বরূপ, শ্রাবণী, কুন্তল ও অনন্যা মুখার্জী/আনন্দপল্লী, কলি-৯৩;

।। ২৪ পরগনা (উঃ/দঃ)।।

তাপস, সপ্তর্ষি ও শাশ্বতী ভট্টাচার্য/নোয়াপাড়া বাই লেন, গারুলিয়া (উঃ); রণবীর ও সৌরভ/নরেন্দ্রপুর (দঃ); পিবু, টুটুন, গুল্লু ও প্রতিমা দাস/আতপুর (উঃ); পীযূষ, নিবেদিতা, স্বর্ণকমল, তপসী ও সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী/বোড়াল, মাঝেরপাড়া (দঃ); পরশ, মামণি, পবন, রানী, টুটুল, লিলি, রাহুল, দীপ, দোয়েল, কুণাল ও বিলাস/সিঁথিপাড়া, বারাসাত (উঃ);

।। হাওড়া ।।

মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; অমিতাভ, অরুণাভ ও অরিন্দম ঘোষ/সদর বক্সি লেন; ইন্দ্রনীল, ঐন্দ্রিলা, জয়তী ও তুহিন কুমার গুপ্ত/নবকুমার নন্দী লেন, চৌধুরীবাগান;

।। হুগলী ।।

সৌমদীপ, দীপাঞ্জন ও দাদু/ডানকুনি হাউজিং এস্টেট, ডানকুনি; অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ/ইন্দিরা পল্লী, আরামবাগ;

।। বর্ধমান ।।

শ্যামসুন্দর, সঞ্জিত, পিনাক, সরস্বতী, ভাই ও সুতপা মল্লিক/রায়ান, বাগানপাড়া; সুতপা, সুমিতা, সৈকত, শঙ্করী ও জীবন কুমার দে/টাউন হল পাড়া, কাটোয়া; অনুমিতা সরকার/জিলাপী বাগান; রজত ও রাজেশ কুমার চট্টরাজ/রক্ষিতপুর; মিষ্টি, জুম, টিনি, তিতির, তুতু ও উত্তম কুমার বটব্যাল/উর্বী আর্যাবর্ত, দুর্গাপুর; বাসবী, শতভিষা, যশোধরা ও ডাঃ উত্তম কুমার বটব্যাল/আলডিহি অফিসার্স কোয়ার্টার, আলডিহি; তারাশঙ্করী, তিমির, জ্যোতি, দেবজ্যোতি, টমা, বিভীষণ, অনন্যা, বিশ্বদীপা, মল্লিকা, মঞ্জরী, গৌতম, রামপ্রসাদ ও ভারবি/কেন্দুড়;

।। মেদিনীপুর ।।

নটু, ঘেঁটু ও ছোটমামা/বাজকুল; সোনামা, বাবুসোনা, তৃপ্তি ও বিশ্বজিত কর/সুভাষ পল্লী, খড়্গপুর; শুভমিতা, নির্মাল্য ঘোষ ও সৌজাত্য জানা/ঘাটাল হাসপাতাল কোয়ার্টার, ঘাটাল; প্রণব, নন্দিতা ও অনুমতি দাস/কে. টি. পি. পি.; পাপু, পপি, অর্ঘ্য, পিকু, বুল্টি ও রণবীর সামন্ত/কাশুড়িয়াবাড়ি; প্রণীতা, শ্রাবণী, সৌলমী, পিংকি, আগমনী, ছবি, তুলসী ও শেলীনা/কাজলাগড় এম. এস. বি. সি. এম. হাই স্কুল, কাজলাগড়; সৌরভ, সৌলমী, শ্রীধর ও শিবানী সামন্ত/কাশুড়িয়াবাড়ি; শ্রীলেখা, মণিকা, সুপ্তি, স্বর্ণেন্দু, দীপ্তি ও নিমাই নায়ক/গড়বেতা;

।। বাঁকুড়া ।।

দেবতনু, দেবিদাস, পুতুল ও তৃণা ব্যানার্জী/দিগপাড়; ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক ও দেবিদাস ব্যানার্জী/চাতরার মোড়; ডলি, বকুল, মুকুল ও দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/চাটুজ্জোপাড়া; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সৌরাংশু ও স্নেহাংশু/মটুকবনী; বীরেন্দ্র, লতিকা, আশালতা, চিম্পু, তিপ্পি, কল্যাণ, শ্রাবণী ও লিপিকা মুখার্জী/আকুই; জগন্নাথ, মীরা, জয়দীপ ও জয়শ্রী রায়/উখড়াডিহি; তাতাই, ফুলটুসি, পিংকু, দিণ্ডু, প্রভু, বুনু, দেবাশিস, রুবি, হাসি, মুটান ও বুকাই/দেশুড়িয়া;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী/কালীবাড়ি রোড; অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস/অমর চক্রবর্তী রোড, খাগড়া; বিশ্বজিৎ মুখার্জী, পাপিয়া, শুভজিৎ ও পুপুন/বনবিহারীপাড়া, জঙ্গীপুর;

।। জলপাইগুড়ি ।।

সমর ও বুলা দে/ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনি, আলিপুরদুয়ার জংশন;

।। বিহার ।।

নিরঞ্জন, রুবেন ও চুমকি করগুপ্ত/জামশেদপুর; কৌশিক ও সৌমিক আশ/চিরকুণ্ডা, ধানবাদ;

।। ত্রিপুরা ।।

ছন্দক ও ছন্দশ্রী বিশ্বাস/আগরতলা।

বিচিত্র খবর

বরুণ মজুমদার

কাগজের মোটরগাড়ি

কাগজের মোটরগাড়ি তৈরি করার কথা শুনলে অনেকে ভাববেন বোধহয় একটা খেলনা। কিন্তু মোটেই তা নয়, আসলে এই কাগজের মোটরগাড়ি যাত্রী নিয়ে চলতে পারে, এর গতিও বেশ দ্রুত।

জাপানে এখন সর্বাধুনিক আকর্ষণ হলো এই কাগজের মোটরগাড়ি। সে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় আইচি শহরে এটি তৈরি হয়েছে। দু'হাজার পাঁচ সালের জুন মাসে জার্মানির হ্যানোভারে বিশ্ব বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে এই গাড়িই হবে প্রধান আকর্ষণ। জাপানের একদল শিল্পী মিলে এই কাগজের মোটরগাড়ি তৈরি করেছেন। কাগজ দিয়ে নয়, কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি এই গাড়ি হাল্কা হলেও বেশ মজবুত। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালিত এই ধরনের মোটরগাড়ি বিশ্বে এই প্রথম তৈরি হলো। জাপানের ঐতিহ্যবাহী হাতে তৈরি কাগজ 'ওয়াসি' দিয়ে এই মোটরগাড়ির বডির কাজ করা হয়েছে। খুব জোরে বাতাস বইলে এই গাড়ি উল্টে যাবে না। এটি ঘণ্টায় একশো পঁচিশ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। এই গাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে 'হোতারু'। টয়াটো মোটরের রাভার অনুকরণে এই মোটরের ভেতর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভূত ব্যবসা লাটে

অরুণ ঘোষাল

কুসুম গাঁয়ের নকুলকে লোক
ওঝা বলেই ডাকত,
নানা রঙের বোতলে সে
ভূত ধরে সব রাখত,
শাঁকচুন্নির দাঁত উপড়ে
লাল শিশিতে ভরত,
ইলিশ মাছের টোপ দিয়ে সে
স্কন্দকাটা ধরত।
পেত্নিগুলোয় পুরত নকুল
সাদা শিশির মধ্যে,
মামদো ভূতের মুখের ভাষা
যায় না লেখা পদ্যে।

নকুল ছিল মস্ত ওঝা
ভূত ধরাতে পাকা,
ভূত ব্যবসা করে অনেক
কামিয়েছিল টাকা।
সেদিন হঠাৎ শিশিগুলোর
ছিপি গেল খুলে,
ভূতগুলো সব বেরিয়ে নাচে
বাঁশের আড়ায় ঝুলে।
ভূতগুলো সব পালিয়ে গেল
বোতল ভেঙে মাঠে,
নকুল মামার ভূত ব্যবসা
উঠল গিয়ে লাটে।

খোকা বলে

সুবীর গুপ্ত

বাঁশবাগানে গভীর রাতে
মামদো ভূতের ছানা
ঘুম চটানো বিকট স্বরে
গাইছে একটানা।

গানের কথা যায় না বোঝা
নেই সুর, নেই তাল
খেয়াল নয়, ঠুংরি নয়
হয়তো পাড়ছে গাল।

গো-ভূত বলে, গাইছে যেন
বড়ে গুলাম আলি
গান শুনে দেয় ব্রহ্মদত্যি
সজোরে হাততালি।

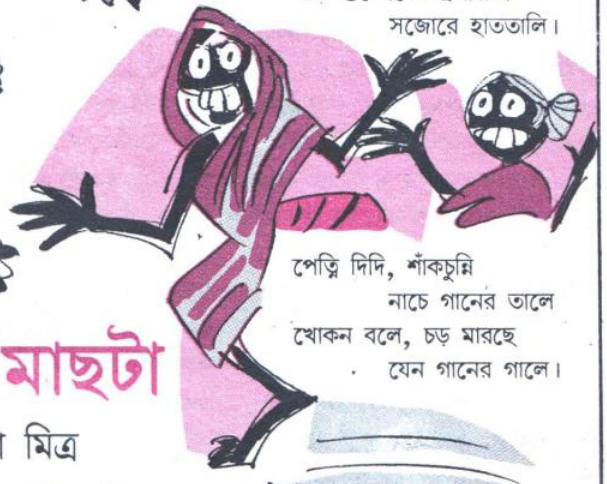

পেত্নি দিদি, শাঁকচুন্নি
নাচে গানের তালে
খোকন বলে, চড় মারছে
যেন গানের গালে।

গেছো ভূত

অশোক লাখদার

এক ছিল গেছো ভূত
থাকত সে গাছে,
খক খক কাশত সে
আসত না কাছে।
ঠ্যাং ছিল চারখানা
ইয়া ইয়া লম্বা,
চার চোখ ড্যাবা ড্যাবা
হরে কর কম্বা।
রাতদিন গাছে বসে
নাচাত সে ঠ্যাং,
নিচে দিয়ে কেউ গেলে
কষে দিত ল্যাং।
বসে বসে নাকী সুরে
গাইত সে গান,
গান যদি শোনো ভায়া
উড়ে যাবে প্রাণ।

সেই মাছটা

কেয়া মিত্র

এক যে ছিল নদী
তাতে পা ডোবাতে যদি
অমনি এক মাছ
যার গা ছিল কাচ কাচ
পায়ের ওপর চড়ে
জোরে কামড়ে দিত ধরে
বলত রেগে, হেঁকে—
'ওহে ডাঙায় যাও, যাও
ডাঙা তোমার বাসা
এই আমরা বরং ভালো আছি
জলের মধ্যে খাসা।'

ছবিঃ সুফি

ভূতের বাপের ছেরাদ্দ

সুবোধ তালুকদার

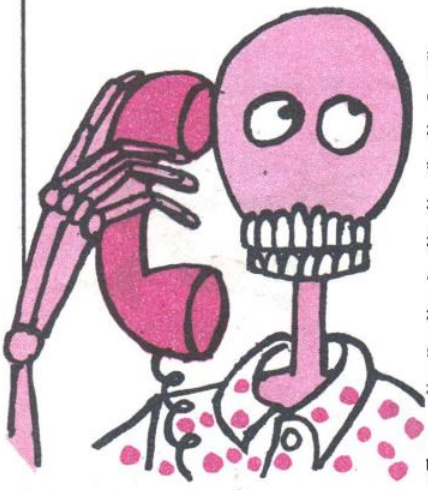

ভূতুড়ে ফোন পেয়েই পুরুত-ভূতের কাছে ছুটে যায় গোঁবরাঁ। গোঁবরাঁ মানে গোবর্ধন—মরে যাবার পর গোঁবরঁধন আর তাই থেকে আদরের গোঁবরাঁ। সবকিছু শুনে, পুরুত-ভূত ছেরাদ্দের যা একখানা লিস্টি ধরিয়ে দেয় তাতেই হয়ে যায় গোঁবরাঁর। একবার ছেরাদ্দ হয়ে যাওয়া বাপের আবার ছেরাদ্দ করতে যে এতকিছু লাগবে, তা কী করে বুঝবে সে। আর এতসব জিনিসপত্তর জোটাবেই বা কোত্থেকে। আগের মতো তো আর মাঠের পর মাঠ, জঙ্গলের পর জঙ্গল, জলার পর জলা ভূতেদের দখলে নেই। এমনকি শেওড়া গাছগুলো পর্যন্ত শেষ। তাছাড়া, এখনকার মানুষগুলো এমন সেয়ানা হয়ে উঠেছে যে, ঘাড় আর মটকানো যায় না কিছুতেই। পুঁচকে-গুলোকেও কায়দা করা যায় না। কিন্তু, তাই বলে কি ভূতের সংখ্যা কমছে? মোটেও না। বরং, বেড়ে চলেছে তো চলেইছে। আর বাড়বে নাই-বা কেন! এখন কি আর কেউ ছেরাদ্দের মন্তর ঠিক ঠিক বলাতে পারে, না বলতে পারে! আজকাল তাই কেউ আর সগ্গে যেতে পারে না। যত ভিড় এই ভূতলোকেই। গোঁবরাঁর বাবা অবশ্য গোঁবরাঁর মতো ভূতলোকের এমন নিচের সারিতে নেই, এর অনেকটাই ওপরে। প্রায় সগ্গের কাছাকাছিই আছে।ওখানেই আটকে রয়েছে আর একটা ধাক্কার জন্যে। আর সেই কারণেই ফোন। গোঁবরাঁ পষ্ট শুনতে পায়, কীঁ-রেঁ গোঁবরাঁ, আঁরঁ কঁতঁকাঁলঁ এঁমঁনঁ কঁরেঁ পাঁকঁ খাঁবঁ। আঁরঁ কঁতঁকাঁলঁ সঁগ্গেঁরঁ এঁতঁ কাঁছাঁকাঁছিঁ এঁসেঁ ঝুঁলেঁ থাঁকঁবঁ। আঁরঁ এঁকঁটাঁ ধাঁক্কাঁরঁ ব্যাঁবঁস্থাঁ কঁরঁ। তাঁড়াঁতাঁড়িঁ কিঁছুঁ এঁকঁটাঁ কঁরঁ রেঁ এঁ-এঁ-এঁ...

এই নিয়ে গোঁবরাঁর মনে এখনও কম দুঃখ নেই। নিজের ছেলেরা যা করেছে —করেছে। কোনওরকমে নমো নমো করে ছেরাদ্দ করেছে বলেই গোঁবরাঁর এই দুর্দশা। কিন্তু তার জন্যে মোটেও দুঃখ নেই তার। যত দুঃখ ওই বাপকে নিয়ে। বাপ মারা যাবার পর, জমিজিরেত বিক্রি করে, ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে, ধারদেনা করে খুব ঘটা করেই বাপের ছেরাদ্দ করেছিল গোবর্ধন। এমনকি নাদুসনুদুস একটা ষাঁড় বাছুরও বাপের নামে ছেড়ে দিয়েছিল। পুরুতমশায়ের কথামতো সব করেছিল। কোনও কিছুতেই চাপাচাপি করেনি। মন্তর বলার সময়েও, মন দিয়ে শুনে শুনে পুরুতমশায়ের মতো মন্তর বলেছিল। ঠিকঠাক চলছিল সবকিছু। কিন্তু তবুও, অঘটন ঘটল। লিস্টির কী একটা জিনিস কম পড়ায় আটকে গেল বাপ। নট নড়ন-চড়ন অবস্থায় ওখানেই ঝুলে রইল। এই নিয়ে বেঁচে থাকতেও যেমন গোবর্ধনের দুঃখ ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। ফোন পেয়েই তাই পুরুত-ভূতের কাছে ছোটা। আর না ছুটেই বা করবে কী! বাপের সাধ ছেলে ছাড়া আর মেটাবেই বা কে?

লিস্টি নিয়ে পুরুতের কাছ থেকে ফিরেই পচা-বাসি যা পেল তাই একটু মুখে দিয়ে, দু'কাঁধে দুই বস্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গোঁবরাঁ। পুরুত-ভূতের দেওয়া একমাস সময়ের মধ্যে লিস্টিমতো ছেরাদ্দের সব জিনিস যোগাড় করতে হবে। পড়শী এবং বন্ধু ভূতদের ভূরি-ভোজের ব্যবস্থাও করে ফেলতে হবে ওই সময়ের মধ্যে। তাই, সকাল-দুপুর, বিকেল-সন্ধ্যে, রাত-ভোর দুই কাঁধে দুই বস্তা নিয়ে গোঁবরাঁ ছোটে আর ছোটে। পুন্নিমেতেও ছোটে, অমাবস্যাতেও ছোটে আর লিস্টি মিলিয়ে মিলিয়ে জিনিসপত্তর দু'বস্তায় ভরে। কতরকমের জিনিস— জলে-পড়া চাঁদের টুকরো, অমাবস্যা রাতের হিঁ হিঁ বাতাস, শ্মশানের কান্না, মরা পোড়ানোর ধোঁয়া, জোনাকির আলো,

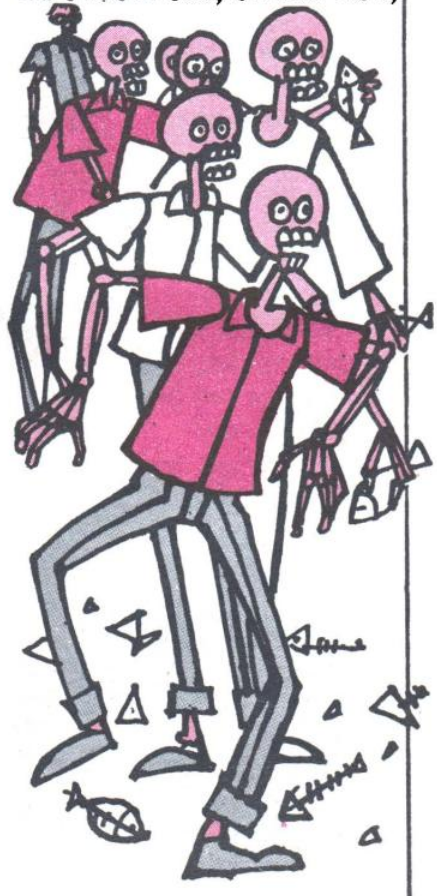

শেওড়া গাছের ঘন ছায়া, আরও কত কী। এ সবই রাখে ডান-কাঁধের বস্তায়। বাঁ-কাঁধের বস্তায় ভরে এঁদো পুকুরের কেদো-মাছ, উচ্চিংড়ের মাথা, কোলা-ব্যাঙের নাড়ী-ভুঁড়ি, কালো বেড়ালের লেজ, নীল শকুনের ঠ্যাং, চামচিকের শুটকি, অমাবস্যার ঝিকিমিক-মেঠাই, নীর পচা ক্ষীর ইত্যাদি। গোঁবরাঁ নাওয়া-খাওয়া ভুলে শুধু ছোটে আর জোটায়। জোটায় আর ছোটে। শেষে ছেরাদ্দের দিন এসে পড়ে।

ছেরাদ্দের দিন সবার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে গোঁবরাঁ। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে পানা-পুকুরে নেয়ে শুদ্ধবস্ত্র পরে ছেরাদ্দের জন্যে তৈরি হয়। পুরুত-ভূত আসে। লিস্টি মিলিয়ে জিনিসপত্তর দেখে খুবই খুশি হয়। পড়শী ও বন্ধু ভূতেরা, মাল্লিগণ্ডার বাজারেও ভূরিভোজের আয়োজন দেখে ধেই ধেই করে নেত্য করে আর গান গায়—

ভূতের বাপের ছেরাদ্দে
পেট ভরাব আনন্দে
নাচব তুলে ঠ্যাং
ড্যাডাং-ড্যাডাং-ড্যাং।

নাচ, গান চলতেই থাকে। ছেরাদ্দে এসে ধেই ধেই করে নেত্য করাটা একদমই ভালো লাগে না গোঁবরাঁর। সাদা দাঁত খটখট করে দু-চারটে কড়া কড়া কথা শুনিয়েও দেয় পড়শী ও বন্ধু ভূতদের।

পুরুত-ভূত সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে গোঁবরাঁকে ধরে নিয়ে এসে পাশে বসায়। খুবই মিহি গলায় মন্তর বলাতে শুরু করে। দু-একবার মন্তর বলতে না বলতেই ফোনে শুনতে পায় গোঁবরাঁ—ভাঁলো রেঁ ভাঁলো, খুঁবঁই ভাঁলোঁ। এঁকটুঁ এঁকটুঁ কঁরেঁ সঁগ্গেঁরঁ দিঁকেঁ এঁগোঁচ্ছিঁ রেঁ গোঁবঁরাঁ। আঁরঁ এঁকটুঁ, আঁরঁ এঁকটুঁ। মঁন্তঁরঁ চাঁলিঁয়েঁ যাঁ গোঁবঁরাঁ, চাঁলিঁয়েঁ যাঁ। এঁই নাঁ হঁলেঁ আঁরঁ পুঁত্তুঁরঁ...লাইনটা হঠাৎই কেটে যায়।

গোঁবরাঁ খুবই খুশি হয়। পুরুত-ভূতের মন্তরে জোর আছে। মন্তর বলতে না বলতেই বাপের ফোন। ফোন পেয়ে ডবল উৎসাহে মন্তর পড়তে থাকে সে। কিন্তু, পড়শী আর বন্ধু ভূতদের জ্বালায় কি আর মন্তর বলার জো আছে! অমন চিৎকার আর খাইখাই করলে মন্তর বলা যায়! একটুও সবুর নেই। এই না হলে আর ভূত!

হঠাৎই খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি থেকে মারামারি শুরু হয়ে যায় ভূতেদের মধ্যে। সে কী হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি, কিলাকিলি আর চিৎকার! ছেরাদ্দের জিনিস লণ্ডভণ্ড হয়ে ছেরাদ্দ পণ্ড হয় হয়। পড়শী ও বন্ধুদের এই ভূতপনা দেখে কিছুতেই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না গোঁবরাঁ। মন্তর পড়া বন্ধ করে পড়শী ও বন্ধু ভূতদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে চার হাত-পায়ে লাথি, কিল, চড়, ঘুঁষি সমানে চালাতে থাকে সে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড!

ছেরাদ্দ পণ্ড হয় দেখে পুরুত-ভূত ওরই মধ্যে ভালো ভালো জিনিস যা পায় তাই গুছিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সটকে পড়ে। অন্যদিকে গোঁবরাঁর সঙ্গে অন্যান্য ভূতেদের জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি, ছেঁড়াছেঁড়ি চলতেই থাকে। গোঁবরাঁর হুঁশ যখন ফেরে তখন আর কিছুই খুঁজে পায় না। পায় না পুরুত-ভূতকেও। ওদিকে ফোনে বাপের চিৎকার চলতেই থাকে—কীঁ রেঁ গোঁবঁরাঁ, মঁন্তঁরঁ থাঁমাঁলিঁ কেঁনঁ? আঁরঁ অঁল্পঁ এঁকটুঁ বাঁকিঁ। মঁন্তঁরঁ বঁলঁ। তাঁড়াতাঁড়িঁ মঁন্তঁরঁ বঁলঁ। গোঁবঁরাঁরেঁ

ছবি : বিজন কর্মকার

ভুতুর ইচ্ছে

কল্যাণী চক্রবর্তী

গা ছমছম করা অন্ধকারে বাচ্চা ভূতের ইচ্ছে করে মানুষের গল্প শুনতে। ওর নাম ভুতু। ভুতু বড়দের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে, গল্প বলো, গল্প বলো। বড়রা ধমক দেয়, ভূতের বাচ্চা কি গল্প শোনে? হাওয়ায় সাঁতার কাটতে পার না? নিদেনপক্ষে মানুষগুলোকে একটু-আধটু ভয়ও তো দেখাতে পার। যত ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে কাণ্ড শিখতে পারবে ততো তোমার কদর হবে। ধমক খেয়ে ভুতু চুপ করে যায়।

সবাই শুধু বকে। কিন্তু ভুতুর দাদা নানারকম গল্প শোনায় ভুতুকে। তবে মানুষের গল্পে কোনো উৎসাহ দেখায় না দাদা। বলে, কেন? মানুষের গল্প শুনতে হবে কেন? ভূতরা কি ফ্যালনা? তুমি কি জান শহুরে মানুষরা গ্রামের মানুষদের ভীষণ শ্রদ্ধা করে। হামেশা 'গেঁয়ো ভূত' বলে? এটা যে কত বড় সম্মান তা তুমি বড় হলে বুঝবে।

অগত্যা ভুতু ঠিক করল সে নিজেই দেখে বেড়াবে মানুষদের কাণ্ডকারখানা। কোথা থেকে শুরু করবে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল রানা-রিয়ার কথা। হাওয়ায় সাঁতার কেটে চলে গেল ওদের বাড়ি। গিয়ে দ্যাখে রানা মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। আর রিয়া ওর পুতুলের স্প্রিং কেটে ফেলেছে, যার জন্য পুতুলটা তার বেহালা বাজাতে পারছে না। রিয়া মুখটা শুকনো করে বারবার চাবি দিচ্ছে। ভুতুর হাত নিশপিশ করতে লাগল ওটা ঠিক করে দেবার জন্য। তাহলে পুতুলটা আবার বেহালা বাজাতে পারবে। রিয়ার মুখে হাসি ফুটবে।

রানা এদিকে অঙ্ক নিয়ে সমস্যাতে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত অঙ্কটা না পেরে বিরক্ত হয়ে স্নান করতে চলে গেল। আর রিয়াকে মা ডাকলেন কোনো কাজের জন্য। ব্যস্, এই সুযোগ, ভুতু রানার অঙ্ক আর রিয়ার বেহালা-বাজিয়ে পুতুল দুটোই ঠিক করে রেখে দিল।

রানা তো স্কুলে গিয়ে দারুণ অবাক। সেই অঙ্কটা ক্লাসে সে একাই পেরেছে। মানে খাতায় করা আছে তারই হাতের লেখাতে। অথচ অঙ্ক সে খুব একটা ভাল পারে না। রিয়াও খুব খুশি হলো তার পুতুল আবার বেহালা বাজাচ্ছে দেখে।

রিয়ার যে কাঠের ঘোড়াটা ছিল তার পিছনের পা দুটো অনেকদিন ধরেই ভাঙা। খোঁড়া পা দুটো ভুতু জুড়ে দিল কোনোরকম আঠা ছাড়াই। এই রকম হাজারো কাজ করে দিল ভুতু রানা-রিয়াকে খুশি করতে।

কৌতূহল বাড়তে লাগল দিনে দিনে রানা-রিয়ার। কে তাদের এইসব করে দিচ্ছে? সে বড্ড ভাল। অদৃশ্য বন্ধুকে নিয়ে আলোচনা করত দুই ভাই-বোনে।

ভুতুর তখন খুব ইচ্ছে হলো একটু আলাপ করতে রানা-রিয়ার সঙ্গে। সে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতেই বলল, ভাই রানা-রিয়া, তোমরা কি আমার বন্ধু হবে? সঙ্গে সঙ্গে রিয়া বলল, তুমি কে? ভুতু কি বলেই বা নিজের পরিচয় দেবে! সে বলল, তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমার ঘোড়ার পা লাগিয়ে দিয়েছি। তোমার পুতুল সারিয়ে দিয়েছি। রানার অঙ্ক করে দিই।

রানা বলল, ও তুমিই সেই লোক? ঠিক আছে তোমার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব

হয়ে গেল। কিন্তু রিয়া অত সহজে ওকে বন্ধু বলে মেনে নিল না। সে বলল, তুমি যে সেই লোক তার প্রমাণ দাও। দেখ আমাদের বিড়াল কিটি কেমন বাঘের মতো দেখতে। ওকে কিছুক্ষণের জন্য সত্যিকারের বাঘ করে দাও তো দেখি। যেমনি বলা অমনি কিটির শরীরটা বড় হতে লাগল। তার পর হালুম করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

রিয়া তো ভয়েই মরে। সে বলে, তাড়াতাড়ি ওকে বিড়াল করো। সঙ্গে সঙ্গে কিটি আবার শান্তশিষ্ট পুষি বিড়াল। মিউ করে ডেকে উঠল। ভুতুর তো ওদের ছেড়ে যেতেই ইচ্ছা করে না। সব সময় ভুতু ওদের সঙ্গে। কেউ দেখতে পায় না অবশ্য।

শুধুমাত্র যখন ওরা স্কুলে ক্লাস করে তখন ভুতু স্কুলের ছাদে ঘুরে বেড়ায় একা-একা। ছাদে ওঠার দরজায় তালা লাগানো। তাতে তো ভুতুর কোনো অসুবিধা নেই। ভুতু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওঠানামা করে দোতলায় তিনতলায় চারতলায়। সিঁড়ির কোনও দরকার হয় না।

ভুতু একদিন স্কুলের সামনের বটগাছের মাথায় চড়ে বসল। বাপরে বাপ, গাছটা এত বিশাল যে সমস্ত শহরটা একসঙ্গে দেখতে পেল। ট্রেন যাচ্ছে কেয়োর মতো, রেললাইন সুতোর মতো। খুব মজা লাগল ভুতুর।

দেখতে দেখতে রানা-রিয়ার অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা হয়ে গেল। দেখা গেল রানা অঙ্কে পেয়েছে ৯৯। সবাই বেশ অবাক হলো। রিয়া সব বিষয়ে ৮০-৯০ করে নম্বর পেল। আর পড়াশোনা প্রায় ছেড়েই দিল। এমনিই যদি এত নম্বর পাওয়া যায় তবে আর পড়াশোনা শিখে কি হবে!

শুধু রানার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। সে কিছুই শিখছে না অথচ এত নম্বর সে পেয়ে যাচ্ছে এটা তার ভাল লাগছে না। সে খেয়াল করল আগে অঙ্কের জন্য যতটুকু চেষ্টা করতো আজকাল আর ততটুকুও করে না সে। একথা মনে হতেই তার নিজের উপর রাগ হলো। ভুতুর উপর তো বটেই।

এরপর ভুতু যখন এলো তখন রানা বলল, দেখ তুমি আর আমাদের কোনো কাজ করে দেবে না। শুধু যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো রাখ। ভুতু পড়ল মহা ফ্যাসাদে। সে যদি কোনো কাজই না করে দেবে তবে আর সে কেন থাকবে এখানে? ভুতু কত অদ্ভুত কাণ্ড করতে পারে। সেগুলো যদি না দেখাতে পারল তবে আর বন্ধুত্বটা থাকে কি করে?

ভুতু রাগ করে বলল, ঠিক আছে তুমি নিজেই অঙ্ক শেখ। রিয়ার খেলনা ভেঙে গেলেও আমি আর আসবো না। এই বলে সে ফিরে গেল নিজেদের ডেরাতে। সবাই অনেকদিন পর তাকে দেখে খুব খুশি হলো। ঝড় তুলে, গাছ দুলিয়ে, ধুলো উড়িয়ে আদর করল তাকে।

ভুতুর দাদাও খুব খুশি হলো ভুতুকে দেখে। ভুতু বলল, মনটা বড্ড খারাপ করতে লাগল তাই চলে এলাম। কিন্তু যাই বল না কেন—আমার ভীষণ মানুষ হতে ইচ্ছে করে। কথাটা শুনে দাদা এমনভাবে নিশ্বাস ফেলল যে ভুতু পরিষ্কার বুঝতে পারল ইচ্ছেটা দাদার বুকেও লুকিয়ে আছে।

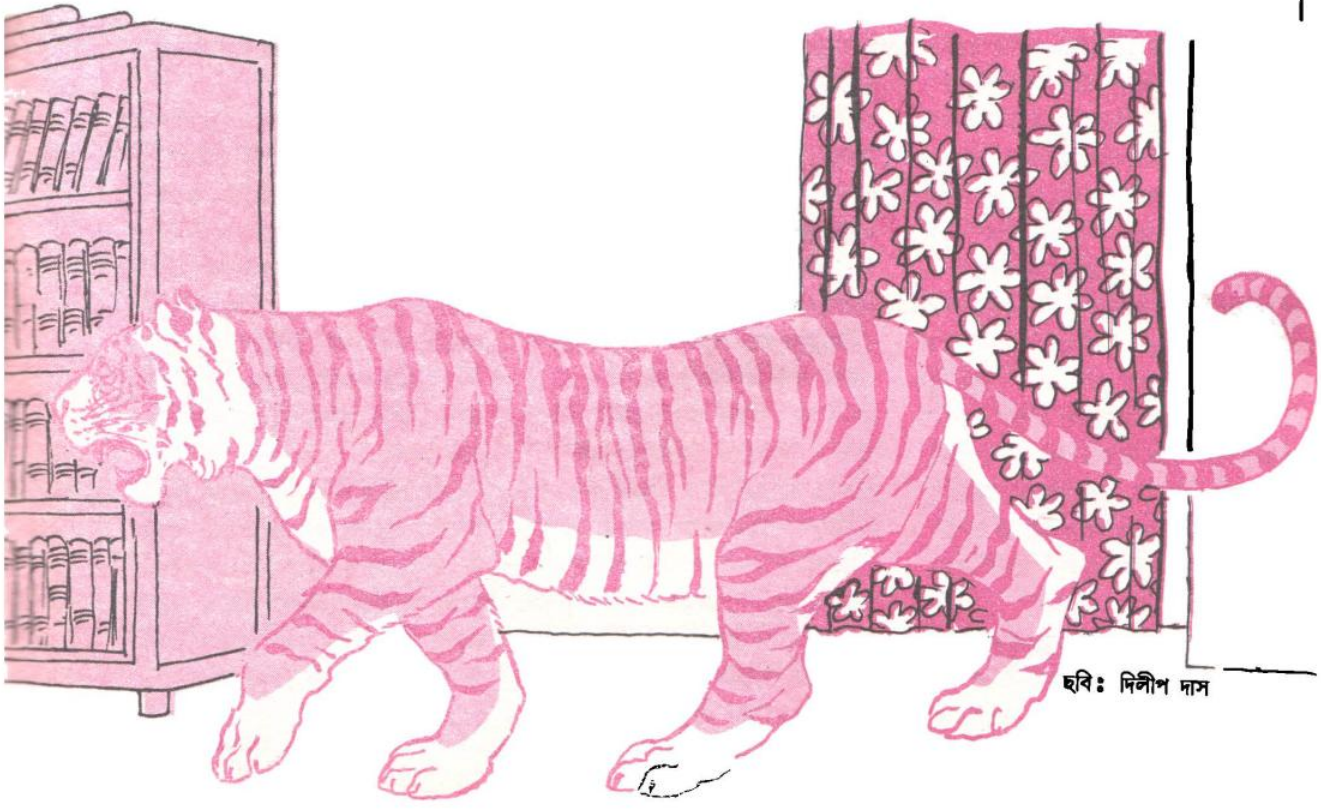

ছবি: দিলীপ দাস

শেষ দেখা

সুব্রত দাস

এই ঘটনাটি বেশ কয়েক বছর আগেকার। এখানে আমি যে বন্ধুটির কথা বলছি সে আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিল। হঠাৎ একদিন কলকাতার কালীঘাটে তার সঙ্গে দেখা হলো। তার বাড়ি মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের কোন গ্রামে তা আমার খেয়াল নেই। কলকাতায় কি একটা কাজে এসেছে। আমিও কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছিলাম। তখনই দেখা হলো। নাম তার শীলা। মেয়েটি আমাদের বাড়ির পাশে মা-বাবার সঙ্গে থাকত। এখানে থেকেই পড়াশুনা করেছে, বড় হয়েছে, এমনকি এখান থেকেই ওর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হবার পর ও মেদিনীপুরে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল।

প্রায় বছরখানেক ওর সঙ্গে আর আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। বহুদিন পরে কালীঘাটে দেখা হওয়ার পর আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেক কথা হলো। যাবার সময় ও একটা ঠিকানা দিল আমাকে। মেদিনীপুরে ওর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা। বিয়ের পর ওর নাম হয়েছে শীলা বৈদ্য। আমি কথা দিলাম সামনের একটা ছুটিছাটা দেখে ওর শ্বশুরবাড়িতে যাব। শুনে ভীষণ খুশি হলো শীলা। ধর্মতলায় গিয়ে ওকে বাসে তুলে দিলাম।

কিছুদিন পরে অফিসে পুজোর ছুটি পড়ল। ভাবলাম শীলার ওখানে ঘুরেই আসি। তবে যাবার আগে একটা চিঠি লিখলাম, যাতে ও মেদিনীপুর বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকে আমার জন্য। মেদিনীপুরে আমি আগে কখনও যাইনি। স্বভাবতই কিছুই সেখানকার চিনি না।

বাড়ি থেকে বের হলাম সকাল সকাল, যাতে পৌঁছাতে দেরি না হয়। ধর্মতলায় গিয়ে মেদিনীপুরের বাস ধরলাম। বাস চলছে। বসে বসে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভাল লাগছিল না। তাই ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে পড়তে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ বাসটা মাঝরাস্তায় এসে খারাপ হয়ে গেল। কাছে-পিঠে কোনো গাড়ি মেরামতের দোকান নেই। অগত্যা ড্রাইভারকেই মিস্ত্রি খুঁজতে নামতে হলো। কতদূরে গিয়ে যে মিস্ত্রি পাবে তা আমার জানা ছিল না। কি আর করি! চুপচাপ বসে রইলাম সিটে। ততক্ষণে বাসের অনেকে নেমে গেছে রাস্তায়। উদ্দেশ্য অন্য বাস ধরবে। সেই বাস এল, তারাও উঠে পড়ল, কিন্তু আমি পারলাম না। বাসটায় বড্ড ভিড়। ভিড় বাস আবার আমার ভাল লাগে না।

অনেকক্ষণ বসে আছি। ড্রাইভার আর আসে না। বাসের বাদবাকি যাত্রীরা অপেক্ষা করে করে ক্লান্তিবোধ করছে। প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চলল, একনাগাড়ে বসে থাকতে কারই বা ভাল লাগে? সবাই যখন বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে ঠিক তখনি ড্রাইভার এল মিস্ত্রি নিয়ে। গাড়ি সারানো হলো, তারপর বাস ছাড়ল। ফলে মেদিনীপুর পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল।

বাস থেকে যখন নামি তখন রাত সাতটা। ওই স্টপেজে আর কেউ নামল না। চারপাশে অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই। ভেবেছিলাম শীলা দাঁড়াবে আমার জন্যে, কিন্তু সেও নেই। বোধহয় দেরি দেখে ভেবেছে আমি আজ আসব না।

শুধু একটা আলো টিমটিম করে

জ্বলছে। দেখে ভাবলাম বোধহয় ওটা চায়ের দোকান। দোকানে গিয়ে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে রওনা দেওয়া যাবে। এই ভেবে এগোতে যাচ্ছিলাম সেই সময় দেখি শীলা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সারা শরীর শাড়িতে ঢাকা শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

শীলা আমাকে বলল, আসতে এত দেরি হলো যে! নিশ্চয়ই মাঝপথে বাসের কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিক তাই, কিন্তু তুই কি করে জানলি? শীলা বলল, মেদিনীপুরগামী বাসের এই একটাই হাল। আমি বললাম, তুই এত রাতে একা এসেছিস, সঙ্গে কাউকে আনিসনি? ও বলল, কাকে আনব, কেউ যে আসতেই চায় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন আসতে চায় না? শীলা বলল, ওরা সব ভয় পায়। তা এসব কথা এখন থাক। বল তোর শরীর কেমন আছে? আমি বললাম, ভাল নেইরে, তাই তো পাড়াগাঁয়ের খোলামেলা পরিবেশে শরীরটাকে সুস্থ করতে চলে এলাম। শীলা বলল, ভাল করেছিস এসে। কারণ তোকেও আমার শেষবারের মতো দেখতে ইচ্ছে করছিল। আমি বললাম, শেষবারের মতো মানে? তুই কি বলতে চাস? শীলা বলল, না, না, মানে আমি বলতে চাইছি যে, পরে আবার কবে আসবি তার ঠিক নেই। দেখ না এখনও যে এসেছিস তাও তো বিয়ের এক বছর পরে। বিয়েতেও আসিসনি। আমি বললাম, হ্যাঁ, বিয়েতে আসিনি ঠিকই, সেটা আমার কাজের চাপের জন্য। শীলা বলল, সেইজন্য বলেছিলাম শেষবারের মতো। কথা শেষ করে ও পা বাড়াল। আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

কথা বলতে বলতে আমরা পথ চলেছি। সবই আমাদের ছোটোবেলার গল্প। বাড়ির কাছাকাছি এসে শীলা বলল, বাবার জন্য ওষুধটা আনতে ভুলে গেছি রে। আমাকে আবার দোকানে যেতে হবে। তুই বরং বাড়িতে চলে যা। আমি একটু পরে যাচ্ছি। ঐ যে আমাদের বাড়ি। তুই গিয়ে আমার নাম করবি তাহলেই হবে। আর শোন, তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আর দেখা হবে না। তোর কোনো যত্ন করতে পারলাম না বলে কিছু মনে করিস না। আমার বাড়িতে তোর যদি কোনো যত্নের ত্রুটি হয় তাহলে ওদের ক্ষমা করে দিস।

শীলার কথায় অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও আমাকে একরকম জোর করেই বাড়ির দিকে ঠেলে দিল। আমার গায়ে ও হাত দিতেই শরীরটা কিরকম যেন শিউরে উঠল। আমি আর কিছু বললাম না। চুপচাপ চলতে লাগলাম। চলতে চলতে পেছনদিকে তাকালাম। দেখলাম শীলা আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল। মনে মনে বললাম, ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আবোল-তাবোল বকে গেল আমার সঙ্গে। বাড়িতে আসুক জিজ্ঞেস করব কেন ও এরকম পাগলের মতো কথা বলল।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ওর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালাম। দরজায় ধাক্কা দিতে এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আজ্ঞে, আমি শীলার বন্ধু, কলকাতা থেকে আসছি। দরজাটা খুলে গেল। ওপাশে এক ভদ্রলোক, হাতে একটা লণ্ঠন। আমাকে দেখে বললেন, ভিতরে আসুন। গেলাম। ভদ্রলোক একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাকে। বললেন, আমি ওর স্বামী। আপনার চিঠি ও দশ দিন আগে পেয়েছিল। আমি বললাম, আমি সব শুনেছি ওর মুখ থেকে। ও একটু পরেই আসবে। আমাকে বলে গেল বাবার জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছে। আপনাদের বাড়িটা শুধু দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এরকমভাবে আমাকে দেখছেন কেন? ভদ্রলোক একইভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, ও তো আর আসবে না। আমি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে? উনি বললেন, শীলা দশ দিন আগে বাবার ওষুধ আনতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে। শোনা মাত্র আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন হলো দেখলাম সূর্যের আলো জানলা দিয়ে ঢুকে গায়ের উপর পড়েছে। আমি তখুনি চলে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু শীলার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছাড়ল না। সকালের জলখাবার আমাকে ওখানেই সারতে হলো। এরপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। শীলার স্বামী আমাকে বাস স্টপেজ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে গেলেন। বাস ছাড়তে আমি মনে মনে বললাম, তোর কথাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। আমি আর আসব না এই গাঁয়ে। তাই তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়ে গেল।

ছবিঃ সুফি

আঁধার রাতের বন্ধু

সোমনাথ নন্দী

সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন ম্যাট্রিক পাশ করে আমাদের পৈতৃক বিড়ির ব্যবসায়ে ঢুকেছি। একদিন রাত এগারোটা নাগাদ তাগাদা করে কাজোড়া থেকে জি. টি. রোড ধরে রানীগঞ্জে ফিরছিলাম। তখন জি. টি. রোড এখনকার মতো এত জমজমাট ছিল না। রাস্তায় এত যানবাহনের ভিড়, এত ইলেকট্রিক আলো ছিল না। সন্ধ্যা সাতটার পর বাসও বন্ধ। তাই হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম। বেশ কয়েক মাইল পথ। রাস্তার আলোগুলোও বন্ধ। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। আকাশটি কালো মেঘে ঢাকা। দূরে কখনও কোথাও কোলিয়ারির আলো দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা লোক ছায়ামূর্তির মতো পেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছগুলি যেন দৈত্যের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার পাথরে হোঁচট খেতে খেতে চলেছি। অবশেষে মঙ্গলপুর মোড়ে পৌঁছলাম।

এখান থেকে রনাই গ্রাম হয়ে রানীগঞ্জ যেতে হবে। সে সময় রনাই ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটি কুখ্যাত গ্রাম। কয়েক ঘর হিন্দু মুসলমানের বসবাস ছিল। গ্রামটি দুর্ধর্ষ ডাকাতদের আস্তানা। ডাকাতরা পথচারীদের টাকাকড়ি কেড়ে নিত। অনেক সময় পথচারীদের গলা টিপে মেরে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিত অথবা মাটিতে পুঁতে দিত। কিন্তু আমাকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। তাই রনাই গ্রামের রাস্তা ধরলাম।

চলতে চলতে দেখলাম একটি লোক অনেকক্ষণ ধরে আমার পিছু পিছু আসছে। লোকটির পরনে কালো শার্ট-প্যান্ট—ফলে অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। রাস্তায় আসতে আসতে একসময় লোকটির সঙ্গে আমার আলাপ হলো। আমরা দু'জনে একসঙ্গে পথ চলতে লাগলাম।

ফাঁকা মাঠের মাঝে পুকুরপাড়ে কতকগুলো লোক আগুন জ্বালিয়ে বসেছিল। আমাদের দিকে নজর পড়তেই ওরা হইহই করে এসে আমাকে ঘিরে ধরল। ওদের পরনে লুঙ্গি ও শার্ট, মুখ ঢাকা, মাথায় টুপি। নিষ্ঠুর মুখ। বুঝতে পারলাম আমি রনাই-এর কুখ্যাত ডাকাতদের খপ্পরে পড়েছি। ওরা আমার বুকের কাছে ছুরি ধরে আমার সুটকেসটি কেড়ে নিল। তারপর ডাকাত সর্দার বলল, 'ওর গলা টিপে মেরে লাশটি পুকুরের জলে ভাসিয়ে দে।' আমি চিৎকার করে বললাম, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' হঠাৎ দেখলাম, আমার সহযাত্রী বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে প্রায় শূন্যে ভাসতে ভাসতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা দুমদাম করে ছিটকে পড়ল। তারপর আমাকে ছেড়ে কোনওমতে প্রাণ নিয়ে পুকুরপাড় দিয়ে দৌড়ে পালাল। আশ্চর্যের বিষয়, আমার সহযাত্রীকে ওরা কিছু করতে পারল না। সহযাত্রী আমাকে মসজিদ পার করে হাসিনা মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিল। সে বলল, 'আমার নাম ভূতনাথ বণিক। আমি আজ থেকে বিশ বছর আগে ব্যবসা করতাম। একদিন রাত্রে তাগাদা করে রনাই হয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। তখন ডাকাতরা আমার সর্বস্ব কেড়ে, গলা টিপে মেরে আমাকে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে রাত্রে আমি এখানে ঘোরাঘুরি করি। তোমাকে অনুরোধ করছি, আর টাকাকড়ি নিয়ে রাত্রে এ রাস্তা দিয়ে যেও না। আবার দেখা হবে।'

আমার সহযাত্রীটি তাহলে ভূত! আমার ভয় হলো। কিন্তু তার সাহায্যের কথা মনে করে মুহূর্তের মধ্যে ভয় কেটে গেল। আমি বললাম, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

আমার পথের বন্ধু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। এরপর আমি বাড়ির পথে রওনা হলাম।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

দেব সাহিত্য কুটীরের উপহার

রামকৃষ্ণ সাহিত্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১৫০.০০

(অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ)

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি আসলে বেদ ও উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য।—স্বামী বিবেকানন্দ

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ৪০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য-সমাজের নেপথ্য কাহিনী

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা সারদা ৩৬.০০

(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত)

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ ৪৪.০০

যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল, তোমাদের আর কাউকে কষ্টভোগ করতে হবে না, জগতের সকলের জন্যে আমি ভোগ করে গেলাম।—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা ও ডাকাতবাবা ৩০.০০

তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত দম্পতির সামনে শ্রীমা সারদা দেবীর চিন্ময়ীরূপে আত্মপ্রকাশের কাহিনী।

নির্মল কুমার রায়ের

চরণ চিহ্ন ধরে ৬০.০০

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র লীলাস্থল)

HIS DIVINE FOOTSTEPS Rs. 12.00

(Complete account of the holy placces)

রবিদাস সাহারায়ের

যুগাবতার রামকৃষ্ণ ২০.০০

আমাদের মা সারদামণি ২০.০০

ভগিনী নিবেদিতা ২০.০০

স্বামী ওঁকারানন্দের

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম প্রসঙ্গ ৪০.০০

ছোটদের জন্য

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিরীটী - ৪ ৪০.০০

(রক্তমুখী ড্রাগন, রাতের আগন্তুক, নিশির ডাক ও বিষের তীর)

সাদা কালো ৫৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

গল্প ভাল আবার বল ৪০.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

যত হাসি ততই মজা ৪০.০০

হাসির ফোয়ারা ৪৫.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কেল্লা রহস্য ২০.০০ **জঙ্গল রহস্য** ১৮.০০

ভাঙা বাড়ির রহস্য ২০.০০ **সুড়ঙ্গ রহস্য** ২০.০০

যাদুঘর রহস্য ২৫.০০ **ফর্মুলা রহস্য** ২২.০০

মুখোশ ১৬.০০ **পাতালঘর রহস্য** ২০.০০ **তীরন্দাজ** ১৮.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর

অপারেশন এক্স ৩০.০০ **ফাঁসি** ২৫.০০

চিত্তরঞ্জন মাইতির

রুরু ৩৫.০০

রাধারমণ রায়ের

রণ ডাকাত ২৬.০০

গৌরী দের

রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২৪.০০

গা ছমছমে ভূতের গল্প ২২.০০

ভূতেরা ভয়ঙ্কর ২৬.০০

মানবেন্দ্র পালের

আতঙ্ক ৩৫.০০ **অশরীরী আতঙ্ক** ৩৫.০০

শিশির কুমার মজুমদারের

অমাবস্যার রাতে ২৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

ভূত পেত্নী রক্তচোষা ৪০.০০

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৬.০০

পূজা বার্ষিকী

আজব বই ৪০.০০ **ঝলমল** ৫৫.০০

শিশুগল্পিকা ৫৫.০০

★ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ☐ ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

Registration No. W. B./RNP/93 October 2000 "Suktara"

আহ্লাদে আটখানা
খেলা ধূলা ফেলে
হাঁদা-ভোদা, বাঁটুল আর
শুকতারা পেলে।

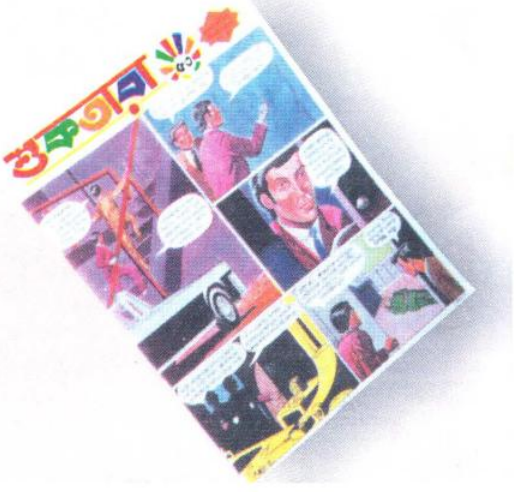

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ৩৫০ - ০২৭০/৪২৯৪/৪২৯৫/৭৮৮৭